সাম্যবাদ

বামপন্থীদের চীন প্রীতি কী ইঙ্গিত বহন করে ৩

রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্ক : শ্রদ্ধা আর স্নেহের অনন্য নিদর্শন ৭

কোয়াড, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও জনগণের স্বার্থ ৮

কোভিড ভ্যাক্সিন: যে ব্যবসা জীবন নিয়ে ৬

web: www.spbm.org বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র মুখপত্র, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুন ২০২১, মূল্য ৫ টাকা

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর সর্বশেষ শারীরিক পরিস্থিতি

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগছেন। সর্বশেষ গত ১৩ মার্চ ২০২১ তারিখে তিনি বাথরুমে পড়ে গিয়ে মেরুদণ্ডে আঘাত পান। এরপর থেকে তিনি হাত ও পা নাড়াতে পারছেন না এবং বিছানায় শয্যাশায়ী অবস্থায় আছেন। এরমধ্যে তাঁকে দু'বার হাসপাতালে নিতে হয়। প্রতিবারেই তাঁকে আইসিইউ ও এইচডিইউ'তে ● ২ এর পাতায় দেখুন

বাজেট ২০২১-২২: টাকা দেয় কে আর পায় কে!

গত ৩ জুন সংসদে ২০২১-২২ সালের বাজেট পেশ হলো। আর ৫ জুন পত্রিকায় রিপোর্ট এলো – আজ যে শিশুটি জন্ম নিল, তার মাথায়ও ঋণের বোঝা চাপবে ৮৪ হাজার ৭৭০ টাকা। এবারের ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকার বাজেটের মধ্যে ঘাটতি ২ লাখ ১৪ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। এ বিপুল ঘাটতি মেটাতে দেশের ভেতর থেকে ও বিদেশ থেকে সরকারকে আরও ঋণ করতে হবে। ফলে আগামী ১ বছরে মাথাপিছু ঋণ আরও কমপক্ষে ১৩ হাজার ৬০ টাকা বাড়বে। ফলে আগামী বাজেটের আগে মাথাপিছু ঋণ দাঁড়াবে প্রায় ৯৮ হাজার টাকা। এ ঋণ ও ঋণের সুদ পরিশোধ করতে হবে জনগণকেই। এটি গত এক যুগ ধরে ক্ষমতায় থাকা জবাবদিহিহীন আওয়ামী লীগ সরকারের তথাকথিত উন্নয়নের নমুনা। বাজেটের সাথে ঋণের বোঝা বাড়ার একটা সম্পর্ক আমরা দেখছি। আসুন, এবারের বাজেটটাই বিচার করে দেখা যাক – মাথাপিছু ঋণ কেন বাড়ছে? ঋণের টাকা কার জন্য ব্যয় হবে? বাজেটের সাথেই বা আমার-আপনার সম্পর্ক কী?

বাজেটের অর্থ যোগাবে কে?

সাধারণভাবে বাজেট হচ্ছে সরকার এক বছরে কোন খাত হতে কত টাকা যোগাড় করবে, আর কোন খাতে কত টাকা ব্যয় করবে তার হিসাব। আবার বাজেটের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ও সরকারের উন্নয়ন দর্শন ও রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি বা পলিসিও বোঝা যায় অর্থাৎ রাষ্ট্র জনগণের কোন অংশকে গুরুত্ব দেবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষকে নাকি মুষ্টিমেয় ধনী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, আমলাদের? সরকার বাজেটে এক বছরে কত টাকা খরচ করবে, তা প্রথমে নির্ধারণ করে। এরপর কত টাকা সংগ্রহ বা আয় করবে, তা ঠিক করে। সরকার টাকা পায় কোথায়? এ টাকা যোগান দেয় দেশের জনগণ। বিভিন্ন কর ও শুল্ক বা ভ্যাট আরোপের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে সরকার এ টাকা সংগ্রহ করে, যাকে বাজেটে রাজস্ব আয় বলা হয়। এ রাজস্ব আয়ের একটা উৎস হলো প্রত্যক্ষ কর। যেমন ব্যক্তির ওপর আয়কর, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপর কর বা কর্পোরেট কর, সম্পত্তি কর। আয়ের আরেকটি উৎস হলো পরোক্ষ কর, যেমন - ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, পর্যটন কর ইত্যাদি। পরোক্ষ কর বাস্তবে জনগণের ঘাঁড়েই পড়ে। সরকার ব্যবসায়ীদের উপর যে ভ্যাট-শুল্ক চাপায়, ব্যবসায়ীরা তা নিজের পকেট থেকে দেয় না। তারা তা পণ্যের মূল্যের সাথে যুক্ত করে দেয়। ফলে বাজারে যে কোনো জিনিস কিনতে গেলে জনগণকেই সে ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়। এবারের বাজেটে প্রত্যক্ষ কর, আয়কর, কর্পোরেট কর হলো রাজস্ব আয়ের মাত্র ৩২%। আর পরোক্ষ কর হচ্ছে রাজস্ব আয়ের ৬৮%। এর মধ্যে ভ্যাট হচ্ছে ৩৮.৭% বা ১ লাখ ২৭ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা। যা ● ২ এর পাতায় দেখুন

দমন, দুর্নীতি আর নিপীড়নের রাজনীতি

গত বছর দেড়েক ধরে দেশের মানুষ এক অস্বাভাবিক ও অস্থির সময় পার করছে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ কখনো কখনো কিছুটা কমলেও তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এখনো শনাক্তের হার ৯ শতাংশের উপরে। প্রতিদিনই হাজারের উপর করোনা রোগী শনাক্ত হচ্ছে। সবমিলিয়ে দেশে ৮ লক্ষাধিক করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। সরকারি হিসাবেই মৃত্যুবরণ করেছে প্রায় ১৩ হাজার। সম্প্রতি আবার সংক্রমণের হার উর্ধ্বমুখী। গত দু'মাস ধরেই এ নিয়ে আতঙ্ক আর অস্থিরতায় সময় কাটছে। সরকার একে কেন্দ্র করে দফায় দফায় লকডাউন বাড়িয়েছে। তবে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিতভাবে লকডাউন না করায় জনদুর্ভোগ বেড়েছে সীমাহীন। সরকার গণপরিবহন বা মার্কেট শুরুতে বন্ধ রেখেছে, আবার মালিকদের চাপের মুখে খুলে দিয়েছে। ঈদের সময় দূরপাল্লার গণপরিবহন বন্ধ থাকায় সীমাহীন ভোগান্তির মধ্য দিয়ে মানুষ গ্রামের বাড়িতে গিয়েছে। আবার একই সময়ে ঘটেছে মর্মান্তিক ঘটনা। ট্রলারে নদী পার হওয়ার সময় ট্রলার ডুবে প্রাণ হারিয়েছে ২৪ জন। এই মৃত্যুর দায় সরকার কোনোভাবেই এড়াতে পারে না। বাস্তবে প্রায় সমস্ত কিছুই খোলা রেখে লকডাউনের নামে প্রহসন করে সরকার সংক্রমণের দায় জনগণের কাঁধে চাপাতে চায়। এখনো আমরা দেখছি বাজার-ঘাটসহ সমস্ত জনপরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মানা ও সচেতনতা তৈরির উদ্যোগ নেই। অথচ, স্বাস্থ্যবিধির নাম করে গণপরিবহনে ৬০ শতাংশ বর্ধিত ভাড়া আদায় করছে, যা মালিকদের স্বার্থই রক্ষা করছে। এমনিতেই করোনা অতিমারীতে জনগণের আয় কমে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বাড়তি বাসভাড়া দিতে তাদের নাভিশ্বাস উঠছে। কিন্তু সরকারের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

গোটা অতিমারী কালে এদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার পঙ্গুচিত্র নগ্নভাবে উন্মোচিত হয়েছে। সরকার চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। বরং কোভিভ-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় চিকিৎসা সরঞ্জাম ● ২ এর পাতায় দেখুন

দফায় দফায় পানির দামবৃদ্ধির অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত বাতিল কর

দফায় দফায় পানির দামবৃদ্ধির অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত, দূষিত পানি সরবরাহ ও প্রকল্প ব্যয়বৃদ্ধির অর্থ জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে ঢাকা ওয়াসা ভবনের মূল ফটক ঘেরাও করে বাসদ (মার্কসবাদী) ঢাকা নগর শাখার কর্মীবৃন্দ। পার্টি ঢাকা নগরের ইনচার্জ নাঈমা খালেদ মনিকার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নগর কমিটির সদস্য সীমা দত্ত ও রাজু আহমেদ। সমাবেশ পরিচালনা করেন পার্টি ঢাকা নগর কমিটির সদস্য রাশেদ শাহরিয়ার। বক্তারা বলেন, "প্রায় দুই কোটি নাগরিকের বসবাস এ ঢাকা শহরে। পানি সরবরাহ একটি পরিসেবা খাত, ঢাকা ওয়াসার দায়িত্ব দুই কোটি জনগণের কাছে পানি পৌঁছে দেওয়া। প্রথমত ঢাকা শহরের দুই কোটি জনগণ পানি পায় না। দ্বিতীয়ত, ঢাকা ওয়াসা যা পানি সরবরাহ করে তা বিশুদ্ধ নয়। পচা কালো পানি, পোকা- ব্যাক্টেরিয়া তো আছেই অনেক সময় সুয়েরেজ লাইনের সাথে পানির লাইন মিলে যাওয়ায় মলযুক্ত পানিও আসে। তৃতীয়ত, আওয়ামী শাসনামলের ● ২ এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রীয় পাটকল আধুনিকায়ন করে চালু, বদলি শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা পরিশোধসহ ৬ দফা দাবিতে বিজেএমসি এবং পাট মন্ত্রণালয়ের সামনে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি পেশ

দাবি আদায় না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষণা

গত ১৩ জুন ২০২১ পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল আধুনিকায়নসহ চালু, বদলি শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা পরিশোধসহ ৬ দফা দাবিতে করিম ও লতিফ বাওয়ানী জুট মিলের চাকরিচ্যুত শ্রমিকবৃন্দ বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন(বিজেএমসি) ও পাট মন্ত্রণালয় বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেছে। সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে করিম জুট মিলের শ্রমিকনেতা মোহাম্মদ ● ২ এর পাতায় দেখুন

সাম্যবাদ

দাবি আদায় না হলে বৃহত্তর

গোফরানের সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সদস্য ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক, করিম জুট মিলের শ্রমিকনেতা জাফর উল্লাহ, এরশাদ-উজ-জামান, লতিফ বাওয়ানী জুট মিলের শ্রমিকনেতা মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, মোস্তফা কামাল প্রমুখ। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন অভিমুখে যায় এবং সেখানে একটি প্রতিনিধি দল বিজেএমসি চেয়ারম্যান আবদুর রউফের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। পাটকল করপোরেশনের সামনে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাওয়ানী জুট মিলের শ্রমিকনেতা গোলাম মাওলা বাহার, করিম জুট মিলের হাসি বেগম, জাফর উল্লাহ, শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি রাজু আহমেদ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাসুদ রানা, শ্রমিকনেতা তসলিমা আক্তার, ভজন বিশ্বাস প্রমুখ। পরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সামনে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, "করোনা মহামারির মধ্যে গত বছর ২০২০ সালের ২ জুলাই রাতে রাষ্ট্রায়ত্ত ২৬টি পাটকলে উৎপাদন বন্ধের নোটিশ টাঙ্গানো হয়। এর ফলে স্থায়ী, বদলি ও দৈনিকভিত্তিক মিলিয়ে এক ধাক্কায় প্রায় ৫৭ হাজার শ্রমিকের কর্মক্ষম হাতকে বেকারের হাতে পরিণত করা হয়েছে। শুধু শ্রমিক নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাটচাষি-পাটশিল্পের ওপর নির্ভরশীল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকানদার ও তাদের পরিবারসহ লক্ষ লক্ষ মানুষ। সরকারী পাটকল বন্ধের সময় বলা হয়েছিল – ৩ মাসের মধ্যে শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যাণ্ডশেকজনিত ক্ষতিপূরণসহ সকল পাওনা মিটিয়ে দিয়ে পাটকলগুলো পুনরায় চালু করা হবে। কিন্তু ১ বছর হতে চললেও এখনো সমস্ত স্থায়ী শ্রমিকের পাওনা পরিশোধ হয়নি। বদলি শ্রমিকদের পাওনা দেয়া এখনো শুরুই করা হয়নি। করোনা মহামারীজনিত লকডাউনের মধ্যে বিকল্প কাজ ও আয়ের অভাবে এই শ্রমিকদের দুর্দশা বর্ণনাতীত। পাওনার টাকাটুকু হাতে পেলে এই অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে তাঁরা কোনমতে চলতে পারতেন। স্থায়ী শ্রমিকরা যারা তাদের পাওনা-র অর্ধেক নগদে পেয়েছেন, তাঁদেরও কিছু অসন্তোষ রয়ে গেছে। ২০১৯ সালের কয়েকটি সপ্তাহের বকেয়া মজুরি, ২০২০ সালের ১ও ২ জুলাই কাজের মজুরি-ঈদ বোনাস, ২০১৫ সালের মজুরি কমিশন অনুযায়ী (যা পাটকলে ২০১৯ থেকে কার্যকর হয়েছে) ২০১৫-১৯ পর্যন্ত বোনাস ও ছুটির টাকার ডিফারেন্স, বৈশাখী ভাতার টাকা ইত্যাদি তারা পাননি বলে অভিযোগ রয়েছে। সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী পাওনার বাকী অর্ধেক টাকার সঞ্চয়পত্রের ত্রৈমাসিক সুদও বেশিরভাগ স্থায়ী শ্রমিক এখনো পাচ্ছেন না।

এদিকে, ১ বছর ধরে অব্যবহৃত পড়ে থাকায় মিলগুলোর যন্ত্রপাতি অচল-নষ্ট, জমে থাকা কাঁচামাল-উৎপাদিত পণ্য লুটপাট এবং জায়গা-জমি বেদখল হওয়ার আশংকা বাড়ছে। শোনা যাচ্ছে সরকার রাষ্ট্রীয় পাটকলগুলো ব্যক্তিমালিকদের কাছে লীজ দেওয়ার চেষ্টা করছে। অতীতে পাটকলগুলোর বেসরকারিকরণের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। বেসরকারীকরণের নামে সস্তায় জমি ও যন্ত্রপাতি লুটপাট করা, বিশাল জমি দেখিয়ে ব্যাংক ঋণ নেয়া, খন্ড খন্ড বিক্রি করে আবাসন ব্যবসার দৃষ্টান্তই আমরা দেখেছি। বন্ধ করা ২৫টি সরকারী পাটকলে ১২০০ একর জমি, কারখানার অবকাঠামো, গোডাউন, যন্ত্রপাতি আছে। মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২৫ হাজার কোটি টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বেসরকারীকরণের নামে জনগণের সম্পদ লুটপাটের আয়োজন করা হচ্ছে কি না – সে আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে।"

বক্তাগণ আরও বলেন, "রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধের পেছনে সরকারের বড় অজুহাত লোকসান। কিন্তু কেন লোকসান, কাদের কারণে লোকসান, লোকসান কাটাতে কী কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল – সে সব প্রশ্নের উত্তর নেই। এর দায় কার, শ্রমিকের না কি ম্যানেজমেন্ট ও নীতি নির্ধারকদের, শ্রমিক একা কেন শাস্তি পাবে – এই প্রশ্ন আমরা দেশবাসীর কাছে রাখতে চাই। পাটকে বলা হতো বাংলাদেশের সোনালি আঁশ। পরিবেশ সচেতনতার কারণে ক্ষতিকর পলিথিন-প্লাস্টিক পণ্যের পরিবর্তে বিশ্বব্যাপী পাটজাত পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। চাল-গম-আটা-চিনিসহ ১৮টি পণ্যের মোড়ক ব্যবহারে পাটের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার আদেশ 'ম্যানডেটরি প্যাকেজিং অ্যাক্ট ২০১০' বাস্তবায়ন হলে দেশের বাজারে পাটের বিপুল চাহিদার সৃষ্টি হবে। ফলে পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। সম্ভাবনা আছে বলেই বেসরকারি পাটকলগুলো লাভ করছে। আমরা মনে করি, আধুনিকায়ন করে পুনরায় চালু করলে ও লোকসানের কারণগুলো দূর করে, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, দুর্নীতিমুক্তভাবে পরিচালনা করতে পারলে রাষ্ট্রীয় খাতে রেখেই পাটকলগুলো লাভজনক করা সম্ভব।"

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধসহ সব গণআন্দোলনে পাটকল শ্রমিকদের উল্লেখযোগ্য সংগ্রামী ভূমিকার কথা তুলে ধরে বলেন, "বর্তমান সরকার পাটের জিনোম সিকোয়েন্স আবিষ্কারের কৃতিত্ব দাবি করে পরিবেশবান্ধব পাটখাত পুনর্জাগরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এসব স্মরণে রেখে ঐতিহ্যবাহী পাটশিল্প ও পাটকলশ্রমিকদের রক্ষায় ৬ দফা দাবি পূরণে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে যাবতীয় পাওনা পরিশোধসহ শ্রমিকদের বাঁচার দাবি বাস্তবায়ন না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা ছাড়া বিকল্প থাকবে না।"

শ্রমিকদের আশু ৬ দফা দাবি :

১. রাষ্ট্রীয় পাটকলের বদলি শ্রমিকদের সকল বকেয়া পাওনা অবিলম্বে পরিশোধ কর।
২. নামের ভুল দ্রুত সংশোধন করে অবশিষ্ট স্থায়ী শ্রমিকদের পাওনা অবিলম্বে পরিশোধ কর।
৩. ২০১৯ সালের বকেয়া সপ্তাহের মজুরি দিয়ে দাও।
৪. ২০১৫ সালের মজুরি কমিশন অনুযায়ী গত ৪ বছরের ছুটি ও ৯টি বোনাস, চিকিৎসা-শিক্ষা ভাতার ডিফারেন্স, বৈশাখী ভাতার টাকা পরিশোধ কর।
৫. বেসরকারি পাটকলে ২০১৫ সালের মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন কর।
৬. রাষ্ট্রীয় পাটকল বন্ধ নয়, আধুনিকায়নসহ চালু কর।
ক্যাজুয়াল ভিত্তিতে নয়, বদলি/স্থায়ী হিসাবে পুরনো শ্রমিকদের অগ্রাধিকারে নিয়োগ দিতে হবে।

দফায় দফায় পানির দামবৃদ্ধির

১৩ বছরে এবার ১৪ বার পানির দাম বাড়ালো ওয়াসা। ঢাকা ওয়াসার দাবি এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, সরকারের কোনো ক্ষমতা নেই এতে হস্তক্ষেপ করার। কিন্তু এটা আমরা বুঝি সরকারের পরিষেবা খাতকে পণ্যে পরিণত করার নীতিতে ঢাকা ওয়াসা চলে। প্রশ্ন হচ্ছে, দাম বাড়লো কেন? আমরা কীসের দাম দিই? পানির দাম নাকি প্রকল্পের দীর্ঘসূত্রিতার বাড়তি ব্যয়?

বর্তমানে ঢাকা ওয়াসার ১০টি প্রকল্প চালু আছে। এর আট প্রকল্পের চারটির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। চারটির মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বাকি দুটি প্রকল্পের একটি ২০২৩, অন্যটি ২০২৪ সালে শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু এগুলোর একটির কাজ ২৩ ভাগ এবং আরেকটির মাত্র ৭ ভাগ হয়েছে। এই ১০ প্রকল্পের মোট ব্যয় ২৬ হাজার ৮৭১ কোটি টাকা। প্রকল্পের সময় বাড়ানোর জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৩৬০০ কোটি টাকা। ঢাকা ওয়াসা নারায়ণগঞ্জে মেঘনা নদীর পানি শোধন করে রাজধানীতে সরবরাহের জন্য ২০১৩- ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭ বছর মেয়াদী প্রকল্প হাতে নেয়। সাত বছরে মাত্র ৩৯ ভাগ কাজ হয়েছে। তাই প্রকল্পের মেয়াদ আড়াই বছর বাড়ে খরচ বাড়ে ২ হাজার ৯০৩ কোটি টাকা। এখন আরও আড়াই বছর মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে ওয়াসা। ফলে খরচ আরও বাড়বে।

আরেকটি প্রকল্প সায়েদাবাদ ফেজ ৩। এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ২০১৫ সালে। প্রকল্পটি ৯৫ কোটি লিটার পানি সায়েদাবাদে পরিশোধিত হয়ে দৈনিক প্রায় ৪৫ কোটি লিটার পানি ঢাকা মহানগরীতে সরবরাহ করার কথা। প্রকল্প ব্যয় ৪ হাজার ৫৯৭ কোটি টাকা। অর্থায়নে আছে ফ্রেঞ্চ ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এএফডি), জার্মানির কেএফডব্লিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, দ্য ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ও ডানিডা। ২০২০ জুনে শেষ হবার কথা থাকলেও গত এপ্রিল পর্যন্ত মাত্র সাড়ে ৪ ভাগ কাজ হয়েছে। ফলাফল খরচ বাড়া ও সময় বাড়া। এভাবেই ঢাকা ওয়াসা তাদের নিজের ২০০৯-২০১৯ দশ বছরের সাফল্য প্রচার করছে। প্রকল্পের বর্ধিত খরচ যোগাতে ১৩ বছরে ১৪ বার পানির দাম বাড়াতে হয়েছে। প্রকল্প দীর্ঘসূত্রিতা ও খরচ বাড়ার কারণ হিসেবে অব্যবস্থাপনা, দলীয়করণ, নির্দিষ্ট ঠিকাদার নির্বাচন, দুর্নীতি, আন্তঃমন্ত্রণালয় অব্যবস্থাপনা ও নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ডিজাইন পরিবর্তন ইত্যাদি দায়ী।

আজ দেশে শিক্ষা, চিকিৎসা, গণপরিবহন, রেল থেকে শুরু করে প্রত্যেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকীকরণের নীতি নিয়েছে। সরকার পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে একই নীতি নিয়েছে। আমরা মনে করি, একটি গণতান্ত্রিক দেশে মৌলিক অধিকার ও পরিসেবা খাতসমুহ দাম দিয়ে কেনা বেচার পণ্যে পরিণত করা গণবিরোধী। এর বিরুদ্ধে আমরা সবাইকে সোচ্চার হবার আহ্বান জানাই।"

দমন, দুর্নীতি আর

ক্রয়ের নামে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দুর্নীতি ও লুটপাটের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। সেই চিত্র ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বরং সম্প্রতি দুর্নীতির অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করায় দৈনিক প্রথম আলোর সাংবাদিক রোজিনা ইসলামকে মন্ত্রণালয়ে আটকে রেখে হেনস্থা ও শারীরিক-মানসিক নির্যাতন করা হয়। পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঔপনিবেশিক আমলের তৈরি 'অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট'-এ মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে সাংবাদিক ও জনতার প্রতিবাদের মুখে তাকে জামিন দেওয়া হয়। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্টের মাধ্যমে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ ও স্বাধীন সাংবাদিকতার পথ রুদ্ধ করার চক্রান্ত যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি দৃশ্যমান। একদিকে সরকারের বিভিন্ন নেতা-মন্ত্রী-মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা দুর্নীতি ও লুটপাট করছে, অন্যদিকে জনগণের ক্ষোভ-রোষ ও আন্দোলন থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য দমনের নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করছে।

করোনা চিকিৎসার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেনি। এই ভাইরাস প্রতিরোধের জন্য বিশ্বজুড়ে কয়েকটি টিকা ইতোমধ্যে উদ্ভাবিত হয়েছে। আমাদের দেশের সরকার টিকা উদ্ভাবন ও উৎপাদনের জন্য কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। টিকা আমদানি করে নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়ার ব্যাপারেও নানা টালবাহানা করছে। ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট কর্তৃক উৎপাদিত অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রেজেনেকার টিকা আমদানি করলেও তা সরাসরি না করে বেক্সিমকো কোম্পানির মাধ্যমে আমদানির চুক্তি করেছে। অতিরিক্ত দামে সরকার আবার বেক্সিমকো থেকে এই টিকা ক্রয় করছে। এভাবে জনগণের অর্থ একটি কোম্পানির কাছে তুলে দিচ্ছে। বাস্তবে সরকারের কাজই হল জনস্বার্থ না দেখে মালিকশ্রেণির সেবা করা। এই ঘটনার মাধ্যমে তা আবার স্পষ্টরূপে প্রতিভাত।

এই মালিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষার আরেকটি দৃষ্টান্ত বাঁশখালির ঘটনা। বাঁশখালিতে এস আলম গ্রুপ কর্তৃক নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের শ্রমিকরা তাদের বকেয়া বেতন, কর্মঘণ্টা কমানো ও ছুটিসহ ন্যায্য দাবিতে বিক্ষোভ করলে পুলিশ গুলি চালিয়ে ৭ জন শ্রমিককে হত্যা করেছে। শুধু বাঁশখালি নয়, টঙ্গিতে হা-মীম গ্রুপের গার্মেন্টস শ্রমিকদের উপরও পুলিশ গুলি চালিয়েছে। ন্যায্য আন্দোলনে পুলিশি দমন-পীড়ন-গুলির ঘটনাই প্রমাণ করে পুলিশ জনগণের সেবক নয়, মালিকশ্রেণি ও ক্ষমতাসীন দলের পাহারাদার।

সরকারের কাজই হল মালিকশ্রেণির সেবা করা। এমনকি হত্যা খুনের মতো ঘটনা ঘটিয়েও মালিকশ্রেণি পার পেয়ে যায়। তেমনটি সম্প্রতি আবারও দেখা গেছে বসুন্ধরা গ্রুপের এমডি সায়েম সোবহান আনভীরের ক্ষেত্রে। কলেজ ছাত্রী মুনিয়ার আত্মহত্যায় সরাসরি ইন্ধন থাকার পরও আনভীরকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। সরকার যতই বলুক 'আইন নিজের গতিতে চলে', কিন্তু দেশের মানুষ তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় বোঝে যে, আইন বাস্তবে চলে টাকা ও ক্ষমতার জোরে। তাই আনভীরকে গ্রেপ্তার করা তো দূরের কথা, প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্প্রতি সে শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্রের পরিচালক পদে সর্বোচ্চ ভোটে জয়ী হয়েছে। পত্রিকায় সেই খবর এসেছে। শুধু মুনিয়া হত্যা নয়, আনভীরের পরিচালক পদে জয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় – সমাজের নৈতিক ভিত কতটা ক্ষয়ে গেছে।

অন্যদিকে উন্নয়নের নাম করে প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ ধ্বংসের আয়োজন চলছে লাগামহীন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের অনেক প্রাচীন গাছ কেটে ফেলা হয়েছে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজের অজুহাতে। উদ্যান ঘিরে যে মাস্টারপ্ল্যান, তাতে দেখা যাচ্ছে এখানে রেস্টুরেন্ট বানানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস অতিমারীতে বিশ্ব জুড়ে আওয়াজ উঠছে প্রকৃতিকে সুরক্ষা দেওয়ার। আর সেই সময় আমাদের সরকার সুরক্ষা তো নয়ই, নির্বিচারে প্রকৃতি ধ্বংসের আয়োজন করছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আবার মন্তব্য করেছেন, গাছ কাটার বিরোধিতা নাকি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধিতা করা। সরকারের কোনো সিদ্ধান্তের/জনস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপের বিরোধিতা করলেই তাকে উন্নয়ন বিরোধী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী আখ্যা দিয়ে সরকার জনগণের কণ্ঠ স্তব্ধ করতে চায়। মানুষকে বিভ্রান্ত করে ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করতে চায়।

এইভাবে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ সরকার একের পর এক পদক্ষেপ নিচ্ছে, যা জনস্বার্থবিরোধী। যদিও আমরা দেখি সরকার পরিচালনা করে রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ। কিন্তু উপরের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে বেক্সিমকো গ্রুপ, এস আলম গ্রুপ, বসুন্ধরা গ্রুপের মতো বড় বড় শিল্পগ্রুপগুলোর স্বার্থ ও চাওয়ার বাইরে সরকারের কিছু করার জো নেই। কারণ বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরাই সবকিছু নির্ধারণ করে। কে ক্ষমতায় আসবে-যাবে, তাও নির্ধারণ করে পুঁজিপতিরাই। যে দল সবচেয়ে ভালোভাবে পুঁজিপতিদের সেবা করতে, স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে – তাকেই পুঁজিপতিরা ক্ষমতায় বসায়। এই পুঁজিপতিদের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতায় আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন। তাই পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ফ্যাসিবাদী কায়দায় দেশ পরিচালনা করছে। ফলে জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অধিকার রক্ষায় আওয়ামী লীগ সরকারের দমন, দুর্নীতি আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম রচনাই সময়ের প্রয়োজন।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর

রাখতে হয়েছে, কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর বাসায় ফিরে এসেছেন। বর্তমানে তাঁর ফুসফুসে সংক্রমণ আছে, শয্যাশায়ী থাকার জন্য বেড-সোর তৈরি হয়েছে, অপারেশনের পরও সেগুলো এখনও সেরে উঠছে না। ফলে সংক্রমণ এক জায়গা থেকে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে। বর্তমানে তিনি তুলনামূলকভাবে একটু সুস্থ হওয়ার কারণে বাড়িতে আছেন, তবে শারীরিকভাবে স্থিতিশীল অবস্থায় নেই। বিভিন্ন বাম গণতান্ত্রিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, কমরেড মুবিনুল হায়দারের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর সংস্পর্শে আসা সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গ সবসময় তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিচ্ছেন, তাঁদের ভালোবাসা প্রকাশ করছেন। আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

বাজেট ২০২১-২২: টাকা দেয়

২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট থেকে ১১% বেশি। অর্থাৎ এবারের বাজেটের তিনভাগের দুই ভাগ টাকাই আসবে সাধারণ জনগণের পকেট থেকে। বাজেটে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্তদের জন্য কোনো করছাড় নেই। অথচ ব্যবসায়ীদের জন্য কর্পোরেট কর আড়াই ভাগ কমানো হয়েছে, গতবারও যা আড়াই শতাংশ কমানো হয়েছিল। দেওয়া হয়েছে আরও নানা করছাড়। আবার সরকার যে পরিমাণ ব্যয় করবে, রাজস্ব আয় থেকে পুরোটা যোগাড় হবে না। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি ধরায়, ২ লাখ কোটি টাকার বেশি ঘাটতি মেটাতে সরকার যে ঋণ করবে, তার সুদ আসল আবার জনগণ থেকেই সরকার আদায় করবে। প্রশ্ন হলো, যাদের থেকে নেওয়া হবে প্রায় সমুদয় টাকা, বাজেটে তাদের কথা কি মনে রাখা হলো? টাকা দেয় কে, আর পায় কে?

বাজেটে ব্যয় দুই ধরনের। একটা হলো রাজস্ব বা অনুন্নয়ন ব্যয়, যার বড় অংশ ব্যয় হয় সরকার পরিচালনার কাজে, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত আমলা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতায়, সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণসহ নানাবিধ খরচ চালাতে। এর বাইরে সরকার বিভিন্ন খাতে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি, প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য যে খরচ করে, তা বাজেটের উন্নয়ন ব্যয়। এবারের বাজেটে মোট ব্যয়ের ৬০% বরাদ্দ রাখা হয়েছে অনুন্নয়ন খাতে। অথচ, স্বাভাবিক ছিল করোনাকালীন বাস্তবতা বিবেচনায় সরকার অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় কাঁটছাট করবে, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-কর্মসংস্থান ইত্যাদি জরুরি সেবামূলক খাতে ব্যয় বাড়াবে। কিন্তু সরকার সে পথে হাঁটেনি। আবার উন্নয়ন ব্যয়ের বড় অংশই লুটপাট-দুর্নীতি-অপচয়ের ফলে জনগণের কাছে পৌঁছায় না।

দেখা যাচ্ছে এবারের বাজেটে সিংহভাগ বরাদ্দ রাখা হয়েছে অনুৎপাদনশীল জনপ্রশাসন, সুদ পরিশোধ, প্রতিরক্ষা, জনশৃঙ্খলা ইত্যাদি খাতে। জনপ্রশাসন খাতে বেতন-ভাতা পরিশোধ, পেনশন, ভর্তুকি, প্রণোদনাসহ মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১ লাখ ৮৫ হাজার ৪২৩ কোটি টাকা, যা বাজেটের ১৮.৭% । প্রতিরক্ষা(সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী) এবং জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর (পুলিশ-র‍্যাব-বিজিবি-আনসার) সদস্যসংখ্যা প্রায় ১১ লাখ। এ দুইখাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে বাজেটের মোট ১১% (প্রতিরক্ষা ৬.২%, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ৪.৮%)। ঋণের সুদ পরিশোধেই বাজেটের ১১.৪% ব্যয় হবে। অর্থাৎ এ চারটি খাত মিলেই বাজেটে ৪১.১% বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর সাথে লুটপাট ও দুর্নীতির মেগাপ্রজেক্টে বরাদ্দ (৯%) যোগ করলে বাজেটের ৫০%-এর বেশি এসবেই ব্যয় হবে। এ হলো প্রত্যক্ষ বরাদ্দ, এর বাইরেও এসব খাতে থাকে নানা অপ্রত্যক্ষ বরাদ্দ, যা খালি চোখে দেখা যায় না। এর বাইরে সংশোধিত বাজেট থেকে দেখা যায় – বছর শেষে প্রতিরক্ষা, জননিরাপত্তা ইত্যাদি খাতে বরাদ্দ বেড়ে যাবে, কিন্তু শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কৃষি ইত্যাদি খাতে বরাদ্দ ছাঁটাই হবে। অথচ ১৭ কোটি মানুষের জন্য মৌলিক খাত স্বাস্থ্য (৫.৪%), শিক্ষা (১১.৯২%) আর কৃষি (৫.৩%) মিলে বরাদ্দ বাজেটের মাত্র ২২.৬২% । বাস্তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ, যারা বাজেটের সিংহভাগ যোগান দেয়, তাদের বঞ্চিত করে বাজেটের সিংহভাগ ব্যয় করা হবে অনুৎপাদনশীল ও সামরিক-বেসামরিক আমলা খাতে। সুতরাং বাজেটের উদ্দেশ্য যে জনগণের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কর্মসংস্থান ইত্যাদি মৌলিক অধিকারের বাস্তবায়ন নয়, তা বাজেট দেখলেই বোঝা যায়।

ব্যবসায়ীদের উজাড় করে দাও

পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সরকার মালিক, শিল্পপতি, পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করবে – এটাই স্বাভাবিক। কারণ রাষ্ট্র মানেই কোন-না-কোন শ্রেণির রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রের 'উন্নয়ন' বলতে দেশের শিল্পপতি, পুঁজিপতি, মালিকদেরই 'উন্নয়ন'। সে উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতেই রচিত হয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বাজেট। পুঁজিপতিশ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনা করছে আওয়ামী লীগ। পূর্বে বিভিন্নসময় বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামাত এরাও পুঁজিপতিশ্রেণির প্রতিনিধি ● ৬ এর পাতায় দেখুন

বামপন্থীদের চীন প্রীতি কী ইঙ্গিত বহন করে

সম্প্রতি চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিন পিংকে নিয়ে চীনের একটি রেডিও চ্যানেলে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন বক্তব্য রেখেছেন। তাঁরা চীনের রাষ্ট্রপতির প্রশংসা করেছেন এবং সেই প্রেক্ষিতেই রাষ্ট্র হিসেবে চীনকে তারা কীভাবে দেখেন সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করেছেন। খুব অল্প সময়ের এই সাক্ষাৎকারগুলোতে চীন প্রসঙ্গে তাদের দলের সামগ্রিক মূল্যায়ন পাওয়া না গেলেও কী দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা চীনকে দেখছেন, সে ব্যাপারে একটা ধারণা পাওয়া যায়। তারা 'চীনের কমিউনিস্ট পার্টি'র শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পার্টির নেতা-কর্মী-সংগঠকদের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন।

প্রশ্ন আসে 'চীনের কমিউনিস্ট পার্টি' বলে যে পার্টিটি এখন চীনের রাষ্ট্রক্ষমতায় আছে, সেটা আদৌ কোনো কমিউনিস্ট পার্টি কি না। মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে যে কমিউনিস্ট পার্টি চীনে বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতান্ত্রিক লাল চীন সৃষ্টি করেছিল, সেই কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব কি এখনও আছে? চীন কি এখনও একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র?

প্রশ্নগুলো এই সময়ের প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক। কারণ ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিবেচনায় চীন বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারত-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কেরও নান-মাত্রার প্রভাব বাংলাদেশের রাজনীতি-অর্থনীতিতে প্রতীয়মান হয়। একইসাথে চীন এখন বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি। রাষ্ট্র হিসেবে চীন সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণ বামপন্থীরা দেশের জনগণের সামনে তুলে ধরতে না পারলে চীনের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে বামপন্থা ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হবে। এদেশে শুধু বাসদ নয়, বামপন্থীদের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী দল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) তাদের দলীয় পত্রিকায় সমাজতান্ত্রিক চীনের প্রশস্তি গেয়েছেন বিভিন্ন সময়। ফলে চীন সম্পর্কিত একটা আলোচনা দরকারী। আর এই আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি বামপন্থী দলের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে। কোনো একটি বামপন্থী দলের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, তাদের জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কিত নীতিনির্ধারণ কেমন হবে – তা এই আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়।

আমাদের এই আলোচনা একটি তাৎক্ষণিক ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা। ইতিহাসের ঘটনা ধরে ধরে চীন সম্পর্কিত একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন আমরা হয়তো পরবর্তীতে করতে পারব।

মাও সে তুং-এর মৃত্যু ও চীনে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা

খোদ বাসদ-এর মুখপত্র 'ভ্যানগার্ড' পত্রিকার ২০০৩, ২০০৪ ও ২০০৫ সালে প্রকাশিত সংখ্যাগুলোতে ধারাবাহিকভাবে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। প্রবন্ধটির নাম 'মাওয়ের লালচীন কোথায় যাচ্ছে?' কলকাতার একটি সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধটি ভ্যানগার্ড পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশ করা হয়। সেখানে মাও সে-তুংয়ের মৃত্যু পরবর্তী সময়ে চীনের পরিস্থিতির একটি সম্যক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। তার পুঁজিবাদী অর্থনীতির দিকে যাত্রা, এই উল্টোপথে চলার ক্ষেত্রে কারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন বা রাখছেন, পণ্য অর্থনীতির দিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ তারা নিয়েছে এবং চীনের অর্থনীতি ও সমাজজীবনে তার প্রভাব কী এই চিত্রই সেখানে তুলে ধরা হয়েছে।

২০০২ সালের ৮ থেকে ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষোড়শ কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে ছিল সেই আলোচনাটি। এই কংগ্রেসের শুরুতেই চীনের পার্টিতে পুঁজিপতিদের স্বাগত জানানো হয়েছে। একইসাথে বলা হয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক চীনে ব্যাপক সংস্কার সাধিত হবে এবং সেই সংস্কারের বড় শরিক হবেন পুঁজিপতিরাও।

এ বক্তব্যে গোটা বিশ্বের সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষ মর্মাহত হলেও যারা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাপারে খোঁজখবর রাখতেন এবং চীনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন, তাদের কাছে এটা আশ্চর্যের ছিল না। কারণ, পরিবর্তন অর্থাৎ উল্টোদিকে পরিবর্তনটা শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই, কমরেড মাও সে তুংয়ের মৃত্যুর পর। মাও সে-তুং জীবিত থাকতেও চীনের সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য তাকে এক কঠিন ও কষ্টকর লড়াই করতে হয়েছে। ১৯৪৯ সালের বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সময় এই তর্ক উঠেছিল যে 'Production in command' নাকি 'Politics in command'। মাওয়ের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। তিনি জানতেন তাঁদের উৎপাদন দরকার, এর জন্য দক্ষতা দরকার। কিন্তু তিনি যে কোনো প্রকারে উৎপাদন বাড়াবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি জানতেন তাতে উৎপাদন বাড়বে, কিন্তু সমাজতন্ত্র মার খাবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের সামরিক-অর্থনৈতিক শক্তি সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারে না, রক্ষা করে রাজনৈতিক শক্তি অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক চেতনা। তাই তিনি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য Material incentive (বস্তুগত প্রেরণা) এর বিরোধিতা করতেন। তিনি Moral incentive (নৈতিক প্রেরণা)'র পক্ষে ছিলেন। তিনি বলেছেন 'এক্সপার্ট' চাই, কিন্তু চাই 'রেড এন্ড এক্সপার্ট'। সমাজতান্ত্রিক চেতনাহীন, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত লাভ ও উপার্জনের উদ্দেশ্যে নিজের দক্ষতাকে কাজে লাগানো এই এক্সপার্টদের দিয়ে আমরা গড়ে না উঠা পর্যন্ত কাজ চালিয়ে নিতে পারি, কিন্তু সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সাম্যবাদের শিক্ষায় শিক্ষিত এক্সপার্ট তৈরি করতে হবে। এই দুই লাইন নিয়ে তখন চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে বিতর্ক উঠে। একটা লাইন নিয়ে লড়াই করেছেন মাও সে-তুং, অপরদিকে বস্তুগত প্রেরণা দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে ছিলেন লিউ শাও চি। বাস্তবে লিউ শাও চির লাইন পরাস্ত হয়েছিল। মাওয়ের লাইন জয়যুক্ত হয়েছিল। আর এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চীন গড়ে তুলেছিল অসাধারণ অনেক চরিত্র।

ফলে দল ও রাষ্ট্রকে একটি সঠিক রাজনৈতিক লাইনে পরিচালিত করা ও তার ভিত্তিতে অর্থনৈতিকভাবে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য মাও সে-তুংকে দলের মধ্যে একের পর এক সংগ্রাম করে যেতে হয়েছে, যা মাওয়ের মৃত্যুর পর অনুপস্থিত হয়ে যায়। দলের অভ্যন্তরে তখন সংকট শুরু হয়। মাওয়ের মৃত্যুর পর পার্টি দেন জিয়াও পিংয়ের কর্তৃত্বে চলে আসে। তিনি মাওয়ের লাইনের বিরোধী ছিলেন। ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দেংকে দলীয় পদ থেকে অপসারন করা হয়। কিন্তু মাওয়ের মৃত্যুর পর তিনিই সর্বময় ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে উঠেন। বাস্তবে মাও পরবর্তীকালে চীনের যে রূপান্তর ঘটে, সে যুগটাকে দেং-এর যুগ বলা যেতে পারে। চীনের অর্থনৈতিক সংস্কারের মূল পরিকল্পনাকারী ও স্রষ্টা ছিলেন দেং। পরবর্তী নেতারা শুধু দেংয়ের পথ অনুসরণ করেছেন।

এই অর্থনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়ার শুরু হয় দুটি স্লোগান দিয়ে, যা আজও আমরা চীনের নেতাদের মুখে শুনতে পাই। এক. চীনের বৈশিষ্ট্যে সমাজতন্ত্র (Socialism with chinese characteristics) দুই. সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি (Socialist market economy)।

এই সংস্কার প্রক্রিয়ায় আঘাতের প্রথম লক্ষ্যবস্তু হয় চীনের কমিউনগুলো। চীনের এই কমিউনগুলো গড়ে উঠেছিল যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে। চীনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এই কমিউনগুলোর প্রত্যক্ষ ও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এই কমিউনগুলোকে হঠাৎ করে ভেঙে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই যৌথ উৎপাদনকে ভেঙে প্রথমে 'পারিবারিক দায়িত্ব প্রথা' নামে এক নতুন ব্যবস্থা নিয়ে আসা হয়। যৌথ উৎপাদনব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে জমিতে চাষের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয় একক পরিবারের হাতে। এ দিয়ে শুরু। এরপর ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর বেসরকারিকরণ, মুদ্রা নীতির সংশোধনসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে চীনে দ্রুত পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে।

চীনের বর্তমান পরিস্থিতি কী?

১৯৯৪ সালে চীন শ্রম আইন সংশোধন করে শ্রমিকদের মজুরি দাসে পরিণত করে। শ্রমিকদের ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সে কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয় এবং শ্রমকে মজুরির বিনিময়ে বিক্রয়ের পণ্য হিসেবে গণ্য করে। চীনের শ্রম আইনের আর্টিকেল ১০-এ আছে যে, শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্র প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজকে উৎসাহিত করবে। ২০০১ সালে চীন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হয়। ফোবর্সের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, রাজধানী বেইজিংয়ে এখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিলিয়নিয়ার বাস করেন। ১০০ জন বিলিয়নিয়ার নিয়ে তালিকার শীর্ষে বেইজিং। অপরদিকে ৯৯ জন বিলিয়নিয়ার নিয়ে এই তালিকায় দ্বিতীয় নিউইয়র্ক। ৭২৪ জন বিলিয়নিয়ার নিয়ে শীর্ষ রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র। আর ৬৯৮ জন বিলিয়নিয়ার নিয়ে তাকে ছুঁয়ে ফেলতে পেছনে পেছনে ছুটছে চীন। টেনসেন্ট, আলীবাবা, বাইদুং, বাইটড্যান্স এর মতো টেক জায়ান্টের মালিক এখন চীনের পুঁজিপতিরা।

১৯৭৬ সালে চীন সফর শেষে আমেরিকান অধ্যাপক ড. ডোনাল্ড ক্লাইন লিখেছিলেন, "প্রতিশ্রুতি এবং প্রতিশ্রুতি পালন চীনে এক হয়ে আছে, বিশেষত বেকার সমস্যার প্রশ্নে। বেকার সমস্যা নেই। সংবিধানে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি 'কাজ পাবার অধিকার' এখানে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে।"

সেই চীনের এখন কী অবস্থা? এ বছরের ১৫ মার্চ চীনের 'ন্যাশনাল ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস্'-এ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী চীনের শহর এলাকায় বেকারত্বের হার ৫.৫%। তরুণদের মধ্যে বেকাররত্বর হার ১৩.১%। তাদের হিসাব অনুযায়ী ২০২১ সালে ৯০ লক্ষের উপর শিক্ষার্থী পাশ করে চাকরিপ্রার্থী হবে। অর্থাৎ বেকারত্ব আরও বাড়বে।

চীন ১৯৬৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছিল। নিজেদের আভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধিত হয়ে যায় ১৯৬৮ সালের মধ্যেই। তখন চীনের আর কোনো জাতীয় ঋণ ছিল না। আর এখন চীনের জাতীয় ঋণের পরিমাণ ৮ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭১৯ কোটি মার্কিন ডলার।

এটা গেল অর্থনীতির কথা। সমাজজীবনের চিত্র কী? গত ১৯ সেপ্টেম্বর দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় একটি আর্টিকেল প্রকাশিত হয়। 'সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট' এর আর্টিকেল থেকে প্রথম আলো তাদের লেখাটি তৈরি করে। সেই আর্টিকেলে চীনের কয়েকজন শীর্ষ বিলিয়নিয়ারের জীবন ও বেড়ে উঠার বর্ণনা ছিল। সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট এই ধরনের আর্টিকেল কেন করল? প্রথম আলো লিখেছে, " ... বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চেয়ে চীনে বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা দিনকে দিন দ্রুত বেড়েই চলেছে। চীনের অনেক বাবা-মা চায়না ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের 'বিলিয়নিয়ার র‍্যাংকিং'-এ উঠানামাগুলো পড়ে শোনান। তাদের ধারণা, এতে শিশুরা বিলিয়নিয়ারদের জীবন থেকে শিক্ষা নেবেন।

মা-বাবার লক্ষ্য, সন্তানেরা সফল ওই ব্যক্তিদের সফলতার গল্পগুলো জেনে নিজের জীবনকে সাজিয়ে নেবে নিজের মতো করে।" এই হচ্ছে নতুন চীনের বাবা-মায়ের জীবন সম্পর্কিত ধারণা। নতুন কিশোর-তরুণদের বড় হয়ে উঠার আইডল, তাদের স্বপ্ন। আমরা একটু পেছনে যাই। অরভিল শেল ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির বার্কলে স্কুল অব জার্নালিজমের ডিন ও একজন বিখ্যাত সাংবাদিক। চীন ঘুরে এসে ১৯৭৫ সালে তিনি লিখেন, "একটা দেশের সত্যিকারের হাড়ির খবর পেতে হলে এদের ব্যক্তিগত জীবনটা দেখা দরকার।

আমি চীনের যুবসমাজের একটি স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলাম। অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেছি। যে বিষয়টা আমাকে খুব চমৎকৃত করেছে তা হলো নর-নারীর জীবনকে ওরা এক অদ্ভুত স্ট্যান্ডার্ডে তুলেছে। আমাদের দেশে বিলাসী পোশাক, ভাল সাজ-গোজ, চুলের বাহার প্রায় সবারই আকাঙ্ক্ষিত বিষয়, কিন্তু চীনে মানুষকে বিচার করা হচ্ছে তার কাজের দ্বারা, তার রাজনৈতিক চেতনার দ্বারা, সামাজিক দায়িত্বশীলতার দ্বারা। আমি দেখেছি, এটা কোনো পড়িয়ে দেওয়া বক্তৃতা নয়। সেখানে একজন যুবতী তোমাকে অকপটে বলবে যে, সে ত্রিশ বছরের আগে বিয়ে করতে চায়না, কারণ জীবনের সবচাইতে সোনালী দিনগুলোকে সে সমাজতন্ত্র গড়ার কাজে নিয়োগ করতে চায়। এরপরে সে যখন বিয়ে করবে, সে তখন এমন মানুষকেই সঙ্গী করবে যার রাজনৈতিক চেতনার মান উঁচু, যে কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান এবং সর্বদা জনগণের সেবা করতে আগ্রহী। আরও অনেক কথা আছে। কিন্তু এইটুকুই কি আমাদের দেশে আছে? আমেরিকার বিলাসী যুবতীটি তোমাকে বরং অকপটে বলবে যে, সে একজন ফুটবল ক্যাপ্টেনকে উদ্দামভাবে ভালোবাসে। আমরা এই জায়গাতেই পড়ে আছি।"

জীবনের উদ্দেশ্য কিংবা জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমেরিকার সমাজের সাথে চীনের সমাজের যে পার্থক্য এই শিক্ষক ও সাংবাদিকের চোখে পড়েছিল এবং যার জন্য তিনি আফসোস করেছিলেন, আজ ২০২১ সালের চীনে তার লেশমাত্র আছে কি? নেই, কারণ চীনের অর্থনৈতিক ভিত্তিটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যৌথতার বদলে ব্যক্তিগত লাভ প্রাধান্যে এসেছে। ফলে বদলে গেছে এর উপরিকাঠামো, মানুষকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। প্রেম, ভালোবাসা, যৌন জীবন, মূল্যবোধ, নৈতিকতা – সব জায়গায়ই এর প্রভাব পড়েছে।

এরিকা জেন নামে একজন অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিশিয়ান, যিনি পরবর্তীতে ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার শিক্ষক ছিলেন, ১৯৭০ সালে পিকিং ইউনিভার্সিটিতে উচ্চতর শিক্ষার জন্য পড়াশোনা করছিলেন। তিনি ছিলেন চীন বিপ্লবের পর চীনে শিক্ষা নিতে যাওয়া প্রথম আমেরিকান এবং প্রথম বিদেশি শিক্ষার্থী। তাঁর একটা টুকরো স্মৃতি শুনুন, "একদিন দেখতে পেলাম আমার রুমমেট কাঁদছে। কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল যে, সে বুঝতে পারছে তার একটা বদ অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে, তা হচ্ছে বিকালে দু'ঘণ্টা করে ঘুমানো। সে যখন গ্রামে কৃষিকাজ করত, তখন সে মাঠে এই সময়টা অতিরিক্ত কিছু কাজ করত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিশ্রমহীন জীবন তাকে অলস করে তুলেছে এবং তার কাজের প্রতি নিষ্ঠা নষ্ট করে দিচ্ছে। বারবার সে আশঙ্কা প্রকাশ করছিল যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় তাকে শ্রমিক কৃষকের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা জীব করে ছাড়বে। এই ঘটনা আমাকে অবাক করে দিয়েছিল।"

শারীরিক ও মানসিক কষ্ট অসহনীয় হলে মানুষ কাঁদে। কান্না আবেগের প্রকাশ। হাসি-কান্না-রাগ-অভিমান – এ সবই মানবিক অভিব্যক্তি। কিন্তু এর প্রকাশই বলে দেয় এর গভীরতা, রুচি ও সংস্কৃতি কী, এর পেছনে জীবনবোধ কেমন। জীবনকে নিয়ে, জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে সচেতন ও গভীর ভাবনা না থাকলে এই ধরনের ঘটনায় চোখে জল আসে না।

সেই চরিত্র, সেই চরিত্র সৃষ্টির আন্দোলন চীন থেকে বিদায় নিয়েছে। চীনের যৌবন এখন বিলিয়নিয়ার হওয়ার স্বপ্নে বিভোর।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কী ধরনের শাসন সেখানে চলছে

উপরের আলোচনা থেকে একথা পরিস্কার যে, চীনে যদি অর্থনৈতিক সামাজিক সবদিক থেকে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে তা কমিউনিস্ট পার্টি নামক যে পার্টিটি রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে, তার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ সে পার্টিটিও আর কমিউনিস্ট পার্টি নেই, কমিউনিস্ট নাম নিয়ে বাস্তবে সে চীনের বড় বড় পুঁজিপতিদের স্বার্থ সংরক্ষণ করছে। চীন শুধু একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নয়, সে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ এবং শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। চীনের পুঁজিপতিদের উদ্বৃত্ত পুঁজি এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খাটে, সে দেশের সস্তা শ্রম ও কাঁচামাল শোষণ করে। চীনের অভ্যন্তরে এই পুঁজিপতিরা অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের তুলনায় দ্রুত সংহত হচ্ছে। অতি ধনী সৃষ্টি হওয়ার হারে চীন বিশ্বে প্রথম। এর কারণ চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের পুঁজিকে নিশ্চয়তা দিয়েছে, অবাধ শ্রম শোষণ করার সুয়োগ দিয়েছে। চীনের শ্রমিকশ্রেণি ও জনগণের উপর শোষণ যে কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশের তুলনায় অনেক বেশি।

যেসকল তথ্য প্রমাণ আমাদের কাছে আছে, যে তথ্যগুলো চীনের সরকারি সংস্থা থেকেই প্রকাশিত, তাদের প্রবল সেন্সরের মাধ্যমে প্রকাশিত পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত – সেগুলো বিচার করলেই বোঝা যায় চীন একটি পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি এই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রকে রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই দেশের মারাত্মক শোষণমূলক চরিত্রকে না দেখিয়ে শাসক দলকে একটি কমিউনিস্ট দল মনে করা ও তার নেতাকে প্রশংসা করা কী ধরনের রাজনৈতিক বিবেচনায় সম্ভব হতে পারে, তা আমাদের বুদ্ধির অতীত। খালি চোখে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে, একটি বিরাট ক্ষমতাধর চীন যদি একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ হতো তাহলে তার আশেপাশে এবং পৃথিবীর দেশে দেশে চীনকে কেন্দ্র করে সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি হওয়ার কথা। তার কোনো কিছু কি আছে? বরং চীন দেশের পিতামাতারা তাদের ছেলেমেয়েদের কোটিপতিদের গল্প শোনাচ্ছে, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন প্রাক্তণদের মধ্যে কতজন কোটিপতি হয়েছে, তার তালিকা প্রকাশ করছে।

এরপরও চীনকে সমাজতান্ত্রিক মনে করা, তার নেতার প্রশংসা করা এদেশের বামপন্থীদের চিন্তার দারিদ্র্য হতে পারে, ভুল দৃষ্টিভঙ্গিও হতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সাথে সাথে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর অনেকের মনে আজ এই ধারণা জন্মেছে যে, খাঁটি সমাজতন্ত্র এখন অচল। এখন কিছুটা মিশিয়ে, কিছুটা সরিয়ে একটা চেষ্টা করতে হবে। কর্পোরেট জায়ান্টদের উত্থান ঘটিয়ে, তীব্র শ্রম শোষণ করে এবং সকল প্রতিবাদের মুখ বন্ধ করে কীভাবে যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। যে বামপন্থী নেতারা চীনা সাম্রাজ্যবাদের ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোডকে একটা বিরাট কমিউনিস্ট উদ্যোগ মনে করেন, তারাই সেটা ভালো বলতে পারবেন। হয়তো তারা মনে করেন, আগামীদিনের সমাজতন্ত্র জ্যাক মা, রবিন লি, লেই জুংদের মতো বিলিয়নিয়াররাই গড়বে, মাও সে তুং সেখানে জরুরি নয়। আমরা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখি এবং আমাদের শক্তির সাপেক্ষে এখনও এটা স্বপ্ন তা ঠিক, কিন্তু এই ধরনের সমাজতন্ত্রের ধারণা আমাদের স্বপ্নেও আসেনি। সমাজতন্ত্র একটা কল্পনাবিলাস নয়, তার একটা তাত্ত্বিক ভিত্তি আছে। সেটা বিশ্বের এক বিরাট অংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, একটা নতুন সমাজ ও মানুষের উদাহরণ মানবজাতিকে দেখিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতনের কারণ অনুসন্ধান করে ভুল শুধরে লড়াই জোরদার করা বামপন্থীদের কর্তব্য, সমাজতন্ত্রের নাম ভাঙিয়ে নির্মম পুঁজিবাদী শাসন যারা করে, তাদের সমর্থন করা নয়।

সাম্যবাদ

‘মুল্লুক চল’ আন্দোলনের শতবর্ষ পালন

গত ২০ মে রক্তস্নাত মুল্লুক চল আন্দোলনের শতবর্ষ উপলক্ষে ২০ মে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদায় সিলেটের বিভিন্ন বাগানে অস্থায়ী শহিদ বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮টায় সিলেটের মালনীছড়া চা বাগান, লাক্কাতুরা, হিলুয়াছড়া, চিকনাগুল, খান বাগান সহ অন্যান্য বাগানে এই কর্মসূচি পালিত হয়। পুষ্পমাল্য অর্পণ শেষে অনুষ্ঠিত সমাবেশ সমূহে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন-এর কেন্দ্রীয় সংগঠক বীরেন সিং, অজিত রায়, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সিলেট জেলা শাখার আহবায়ক মোখলেছুর রহমান, সদস্য প্রসেনজিৎ রুদ্র, লাক্কাতুরা বাগানের সংগঠক হৃদয় লোহার, আমেনা বেগম, মালনীছড়া বাগানের নমিতা রায়, চম্পক বাউরি, হিলুয়াছড়া বাগানের মনা গঞ্জু, সঞ্চয় কালিন্দী, চিকনাগুল বাগানের স্বাধীন সিং, খান বাগানের পরেশ কর্মকার, রিংকু কর্মকার, পঞ্চমী লোহার প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৮৫৪ সালে সিলেটের মালনীছড়ায় প্রথম বাণিজ্যিকভাবে চা চাষ শুরু হয়। নানা প্রলোভন দেখিয়ে (গাছ হিলায় গা তো পয়সা মিলে গা) লাভজনক চা চাষের জন্য আজীবন কাজের শর্তে ভারতের বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে দরিদ্র কৃষকদের নিয়ে আসা হয়। এ সকল শ্রমিকদের মালিকরা দাসের মতো খাটিয়ে পাহাড়-জঙ্গল পরিষ্কার করে চা বাগান শুরু করে কিন্তু শ্রমিকদের বাঁচার মতো মজুরি, খাবার দেয়া হতো না। ছোট কুঁড়েঘরে গাদাগাদি করে থাকতে থাকতে শ্রমিকদের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হলো। তখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে। এর প্রভাব চা শ্রমিকদের জীবনে আলোড়ন তৈরি করে। চা শ্রমিকরাও বাগানে তাদের বাঁচার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন চা শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ান। শ্রমিকরা তাদের মুল্লুকে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পন্ডিত গঙ্গা দয়াল দীক্ষিত ও পন্ডিত দেওশরণের নেতৃত্বে ৩০ হাজার চা শ্রমিক পায়ে হেটে চাঁদপুর মেঘনাঘাটে পৌঁছায়। সেখানে ব্রিটিশ গোর্খা বাহিনীর হাতে শতশত চা শ্রমিক নিহত হয়। নিহতদের মেঘনার স্রোতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। জাহাজ শ্রমিক ও ছাত্ররা এ আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে ধর্মঘটকে জোরালো করেছিল।

এই ইতিহাসকে শাসকরা, মালিকরা ভয় পায় তাই এ দিবসের স্বীকৃতি তারা দিতে চায় না। মুল্লুক চল আন্দোলনের শতবর্ষ পালিত হচ্ছে অথচ আজকেও চা শ্রমিকদের জীবন পালটায়নি, চা শ্রমিকদের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। সারাদেশে যখন কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য লকডাউন ঘোষণা করে কল-কারখানা বন্ধ রাখা হয়েছিল তখন থেকে এখনও পর্যন্ত সরকারি পরামর্শে মালিকদের স্বার্থে কোনো ঝুঁকি ভাতা ছাড়া চা বাগান খোলা রাখা হয়েছে। চা শ্রমিকদের ভূমি অধিকার না থাকার কারণে ইকোনমিক জোন, টি ট্যুরিজমসহ বিভিন্ন অজুহাতে চা বাগানের জায়গা দখলের পায়তারা চলছে। নেতৃবৃন্দ ২০ মে ‘চা শ্রমিক দিবস’ হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, স্ববেতন ছুটি, ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা, দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা ও ৫ কেজি সাপ্তাহিক রেশন, প্রত্যেক বাগানে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, চা শ্রমিকদের পেনশন ব্যাবস্থা চালু করার দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ সকল চা শ্রমিকদের প্রতি আন্দোলনের মাধ্যমে ‘মুল্লুক চল’ আন্দোলনের প্রেরণায় চা শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের উপর হামলার বিচার, আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের দাবি

টঙ্গির হা-মীম গ্রুপের গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিকদের উপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে এবং আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে গত ১১ মে সকাল সাড়ে ১০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মাসুদ রেজার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সহসভাপতি মানস নন্দী, গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রাজু আহমেদ, সদস্য তসলিমা আক্তার বিউটি, ভজন বিশ্বাস।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, “একটা ন্যায্য আন্দোলনে শ্রমিকদের গুলিবিদ্ধ করে পুলিশ যে হামলা চালিয়েছে, তা খুবই গর্হিত ও ন্যাক্কারজনক। মালিকদের মদদে এই হামলা সংঘটিত হয়েছে। ১০ দিনের ছুটির দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবেই শ্রমিকরা বিক্ষোভ করছিল। ঈদের ছুটি ১০ দিনের পরিবর্তে ৩ দিন করার যে ষড়যন্ত্র মালিকপক্ষ করেছে, তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য না। সারা বছরের কাজের ব্যস্ততায় শ্রমিকরা ছুটি পায় না। তাই ঈদের ছুটিতে পরিবার-পরিজনদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। সেই ছুটির জন্যে কয়েক মাস আগে থেকেই তারা জেনারেল ডিউটি ও ওভারটাইম ডিউটি পালন করে থাকে। ফলে শ্রমিকদের ছুটির এই আন্দোলন ছিল শতভাগ ন্যায্য। আমরা অবিলম্বে শ্রমিকদের উপর এই হামলায় জড়িত মালিকপক্ষসহ পুলিশ সদস্যদের বিচার চাই।”

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, “বর্তমান সরকার মালিকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষায় যেকোনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে বাঁশখালীতে শ্রমিক হত্যার ঘটনায় মদদদাতা মালিকের বিরুদ্ধে এখনও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উল্টো আহত শ্রমিকদের নামে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। টঙ্গির শ্রমিকদের উপর পুলিশি হামলার ঘটনায়ও আমরা দেখলাম, শ্রম আইনে স্বীকৃত ছুটির দাবিতে শ্রমিকরা যখন আন্দোলন করছিল, তখন মালিকেরা তা সহ্য করতে পারেনি।

শ্রমিকদের নিরাপত্তা দেওয়ার পরিবর্তে পুলিশবাহিনী মালিকের নির্দেশে অসহায় শ্রমিকদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে, টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে, লাঠিচার্জ করে প্রায় ৩৫ জনকে আহত করেছে। স্বাধীন দেশে শ্রমিকদের উপর এই অন্যায় নির্যাতন একের পর এক বেড়ে চলেছে।

এর বিরুদ্ধে শ্রমিক-মেহনতি গরিব মানুষদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিকল্প নেই।”

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের আয়ের উপর ১৫% ট্যাক্স আরোপের নামে শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্র সমাবেশ

গত ৩ জুন, প্রস্তাবিত ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে বেসরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের উপর ১৫ শতাংশ কর আরোপের প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল । এই প্রস্তাব প্রত্যাহারের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে ৪ জুন বিকেলে ঢাকার শাহবাগে ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে সংগঠনের বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ার, দপ্তর সম্পাদক সালমান সিদ্দিকী ও ছাত্র ফ্রন্ট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অরূপ দাস শ্যাম।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, শিক্ষার উপর এরূপ আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই কর আরোপের ফলে বেসরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বেশি ফি দিতে হবে। করোনা পরিস্থিতিতে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছেন, অনেক শিক্ষার্থীর পরিবার আর্থিক সংকটে রয়েছে। এ অবস্থায় বর্ধিত ফি-এর বোঝা বহন করা শিক্ষার্থীদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা এর আগেও দেখেছি, সরকার ২০১০ ও ২০১৫ সালে বেসরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি-এর ওপর কর আরোপ করেছিল। কিন্তু শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে পরবর্তীতে তা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। তাই আন্দোলনের ভয়ে সরকার এবার টিউশন ফি-এর উপর সরাসরি কর আরোপ না করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের উপর কর আরোপের প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এ সব প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপর কর আরোপ করলে মালিকপক্ষ তা ফি-বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেই আদায় করবে।”

তাঁরা আরও বলেন “সরকার এক দিকে বলছে, ১৯৯২ এর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, ‘যা শুধুমাত্র শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠিত। আবার এর উপর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মতোই করারোপ করছে। যা সরকারের দ্বিমুখী নীতির পরিচায়ক রাষ্ট্রের কর্তব্য বিনামূল্যে সবার জন্য একমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও তা পরিচালনা করা। কিন্তু আমরা দেখছি, সরকার সে দায়িত্ব অস্বীকার করায় গড়ে উঠেছে বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এবং সেখানে ছাত্রদের টাকার বিনিময়ে পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। সেটা ছাত্রদের জন্য নিঃসন্দেহে কষ্টকর। কিন্তু এই করারোপের ফলে শিক্ষাব্যয় নতুন করে বাড়লে বহু শিক্ষার্থী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও আর পড়তে পারবে না।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা ও জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে ২৫ ভাগ বরাদ্দের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের আয়ের উপর ১৫ শতাংশ কর আরোপের নামে শিক্ষা ব্যায় বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তুকি দিয়ে সকল শিক্ষার্থীর বেতন-ফি মওকুফ, সকল শিক্ষার্থীকে ভ্যাকসিন দিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্যাম্পাস খোলার রোডম্যাপ ঘোষণা, শ্রমজীবী জনগণের খাদ্য ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে গত ৫ জুন শহরে মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সংগঠনের জেলা সভাপতি পরমানন্দ দাসের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক রাহেলা সিদ্দিকা, সাংগঠনিক সম্পাদক বন্ধন কুমার বর্মণ, মাসুদা আক্তার, কলি রাণী বর্মণ, উম্মে নিলুফার তিন্নি প্রমুখ।

বক্তাগণ ২০২১-২০২২ সালের জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে ২৫ ভাগ বরাদ্দ, করোনাকালীন পরিস্থিতিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তুকি দিয়ে সকল শিক্ষার্থীদের বেতন-ফি মওকুফ, পর্যাপ্ত ফিল্ড হাসপাতাল নির্মাণ, শিক্ষার্থীদের মেসভাড়া বাসাভাড়া মওকুফে রাষ্ট্রীয় প্রজ্ঞাপন, করোনাকালে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা, স্বৈরাচারী ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল, ইন্টারনেটে গেম বন্ধ, পর্নোগ্রাফি ও পর্নো ওয়েবসাইট বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ১২০০ টাকা মণ ধরে ধান ক্রয়ের দাবিতে সমাবেশ ও স্মারকলিপি প্রদান

অবিলম্বে সরকারি উদ্যোগে ১২০০ টাকা মণ দরে পর্যাপ্ত ধান ক্রয়ের ঘোষণা, খোদ কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের ব্যবস্থা করা, সরকারি গুদামে কৃষক ছাড়া ব্যবসায়ী, নেতা, দালাল, ফড়িয়াদের ধান বিক্রি নিষিদ্ধ করাসহ ৪ দফা দাবি বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে বেলা ১২টায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গাইবান্ধা সদর উপজেলা শাখার সভাপতি প্রভাষক কমরেড গোলাম সাদেক লেবুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) গাইবান্ধা জেলার আহ্বায়ক কমরেড আহসানুল হাবিব সাঈদ, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুর রহমান খোকা, ডা. জব্বার, নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী প্রমুখ।

বক্তাগণ প্রান্তিক কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের আর্মিরেটে রেশন, ১০ টাকা কেজি দরে ওএমএসের পর্যাপ্ত চাল বিক্রির ব্যবস্থা, টিসিবির পণ্যের দাম কমানো, পাড়ায় পাড়ায় বিক্রির ব্যবস্থা করা, ব্যবহার অনুপযোগী পণ্য বিক্রি বন্ধ করা, জেলায় জেলায় করোনা ল্যাব স্থাপন করে দৈনিক ১ লক্ষ কোভিড টেস্ট করা, করোনা চিকিৎসার বেড সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রতি জেলায় কমপক্ষে ৫০টি আইসিইউ বেড স্থাপন করা সরকারি হাসপাতালে করোনা চিকিৎসার সকল ঔষধ, পথ্য বিনামূল্যে নিশ্চিতের দাবি জানান। কৃষিঋণ মওকুফ করা, এনজিওর কিস্তি আদায় বন্ধ করা, কৃষকদের বিনাসুদে দীর্ঘমেয়াদে পরিশোধযোগ্য ঋণ দেয়া, প্রান্তিক চাষী ও বর্গা চাষীদের সরাসরি আর্থিক প্রণোদনা দেওয়ার দাবি জানান।

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

আর কত কাল ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়

যুক্তরাষ্ট্রের ৩৯ বার ভেটো প্রদানই ইজরায়েল-আমেরিকার সখ্য প্রমাণ করতে যথেষ্ট।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন সংকট উপলব্ধি করতে হলে এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ভালো করে বোঝাটা জরুরি। জায়নবাদী ইজরায়েল যে ব্যাপারটা বারবার সামনে আনতে চায় সেটা হচ্ছে ফিলিস্তিন বলতে স্বাধীন দেশ কখনোই ছিল না। তারা অনেকটা শূন্য ভূমিতে তাদের জন্য প্রতিশ্রুত ভূমিতে রাষ্ট্র গঠন করেছে। অথচ ইতিহাসের দিকে তাকালেই বোঝা যায় কীভাবে পরিকল্পিতভাবে জায়োনিস্টরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় ফিলিস্তিনকে উচ্ছেদ করে ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। দুই হাজার বছরেরও আগে রোমান সাম্রাজ্যের দ্বারা ফিলিস্তিন থেকে উচ্ছেদ হয়ে ইহুদি জনগোষ্ঠী সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে শত শত বছর ধরে তারা ধর্মীয় বিদ্বেষ ও নিপীড়নের শিকার হয়। ১৮৮০-এর দশকে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে ইহুদিবিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় ইহুদিদের জন্য একটি 'জাতীয় আবাসভূমি' প্রতিষ্ঠার ধারণা গড়ে উঠেছিল। হাজার বছর ধরে ইহুদিদের উপর ঘটা অন্যায়ের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই জায়োনবাদের সূত্রপাত হয়েছিল।

১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ওয়ার্ল্ড জায়োনিস্ট অর্গানাইজেশন। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের মিথের ওপর ভিত্তি করে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জন্য তথাকথিত প্রতিশ্রুত ও স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি ইহুদিদের মধ্যে প্রচার ও জনপ্রিয় করে জায়োনিস্টরা। ১৯০২ সালে জায়োনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা থিয়োডর হার্জেলের লেখা ইউটোপিয়ান উপন্যাস ঞযব ড়যফ হবি ষধহফ-এ হার্জেল প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্রের কল্পনা করেন। ঐ বইয়ে প্যালেস্টাইনিয়ান আরবদেরকে নোংরা, কিঞ্চিৎকর, অসভ্য, ডাকাত ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করে তার বিপরীতে ইউরোপীয় ইহুদিদের তাদের ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার কথা বলা আছে। একই কায়দায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সারা দুনিয়া বিশেষত ভারতবর্ষকে সভ্য ও শিক্ষিত করতে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এসে আমাদের শাসন করেছিল। শুরুর দিকে জায়োনিস্টরাও সে পথেই এগিয়ে ছিল। তার সাথে জড়িত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব লর্ড বেলফোর জায়োনিস্টদের দাবি অনুযায়ী প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জন্যে রাষ্ট্র তৈরিতে ব্রিটিশের সহযোগিতার আভাস দেন। সে ঘোষণায় বেলফোর প্যালেস্টাইনে বিদ্যমান অ-ইহুদী জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা নিশ্চিত করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যা ছিল একপ্রকার তামাশা। কেননা, প্যালেস্টাইনে আরব মুসলমানরাই তখন ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যালেস্টাইন ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অধীনে চলে আসে। ফিলিস্তিন ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অধীনে আসার পর থেকেই ব্রিটিশরা ব্যাপকভাবে ইউরোপিয়ান ইহুদি সেটেলারদের ফিলিস্তিনে আসার সুযোগ করে দেয়। আগে থেকেই ইউরোপীয় ইহুদি সেটেলার যারা এসেছিল, তারা শিক্ষাক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থানীয় প্যালেস্টাইন জনগণ থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। ব্রিটিশরা সেটেলার ইহুদিদের নানারকম সুবিধা দিতে থাকে। ইহুদিরা সামরিকভাবে ও অর্থনৈতিকভাবেও ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। তারা নিজেদের সুরক্ষার জন্যে সশস্ত্র বাহিনীও তৈরি করে। ব্রিটিশ শাসনে সেটেলারদের ক্রমাগত সুবিধা দেওয়া ও স্থানীয় ফিলিস্তিনি আরবদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করায় ১৯২৯-৩০ ও ১৯৩৬-৩৯ সালে দুইবার ফিলিস্তিনি জনগণ বিদ্রোহ করে। ১৯৩৬-৩৯ সালের ধর্মঘট ও গণবিদ্রোহ ছিল ফিলিস্তিনিদের যৌথ রাজনৈতিক চেতনার প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ। বেলফোর ঘোষণার সূত্র ধরে ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ড ইহুদি ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার জন্য দুই দফা পরিকল্পনা দিয়েছিল দুটো ব্রিটিশ কমিশন। ১৯৩৭ সালের পিল কমিশনে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জন্যে শতকরা ৩০ ভাগ ভূমি বরাদ্দের প্রস্তাব দেওয়া হয়। আরবরা পিল কমিশন প্রত্যাখ্যান করলেও জায়োনিস্টরা গ্রহণ করে। কেননা এর মধ্য দিয়ে ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটা ভিত্তি তারা পেয়ে যায়। পিল কমিশনে ছোট্ট ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ফিলিস্তিনের বাকি অংশকে মিশর ও জর্ডানের সাথে একীভূত হওয়া এবং বেথেলহাম ও জেরুজালেমকে ছিটমহল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

তার কিছুদিন পরেই চলে আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হলোকাস্টে প্রায় ৬০ লক্ষ ইহুদিকে নির্মম ভাবে হত্যা করে ফ্যাসিস্ট হিটলার বাহিনী। বিশাল পরিমাণ ইহুদি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ইহুদিদের রক্ষায় তাদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবির প্রতি বিশ্বব্যাপী সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। ব্রিটেনের অনুরোধে ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ফিলিস্তিন বিভাজন পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যেখানে ভূ-খণ্ডটির '৫৬% অংশ নিয়ে ইহুদি রাষ্ট্র, ৪৪% এলাকা নিয়ে আরব রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে জেরুজালেম' – এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। ইসরাইলী বুদ্ধিজীবী আইলান পেপের মতে, 'যদি জাতিসংঘ ফিলিস্তিনে ইহুদি বসতি বিবেচনায় নিয়ে তাদের ভবিষ্যত রাষ্ট্রের আয়তন নির্ধারণ করত, তাহলে তা ফিলিস্তিন ভূ-খণ্ডের ১০ শতাংশের বেশি হতো না। কিন্তু জাতিসংঘ ফিলিস্তিনের ওপর জায়নবাদী আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী দাবি মেনে নেয় এবং আরেক ধাপ এগিয়ে ইউরোপে নাজি হোলোকাস্টের ক্ষতিপূরণ দিতে চায়।'

জাতিসংঘের প্রস্তাব ইহুদিরা মেনে নিলেও আরবরা মানেনি। জাতিসংঘে প্রস্তাব গ্রহণের পর থেকেই জায়নিস্ট সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো তৎপর ছিল আতঙ্ক সৃষ্টি করে প্রস্তাবিত ইহুদি ভূমি থেকে যতবেশি সম্ভব ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদের জন্যে। ১৯৪৮ সালের ১০ মার্চ ডেভিড বেন গুরিয়ান ও অন্যান্য শীর্ষ জায়নবাদী নেতা গোপনে মিলিত হন ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে নৃতাত্ত্বিক শুদ্ধি অভিযান প্ল্যান দালেত (প্ল্যান ডি) বাস্তবায়ন করতে। প্ল্যান দালেতকে জায়োনিস্টরা মনে করে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, অথচ সেটি ছিল আসলে ফিলিস্তিন নিশ্চিহ্নকরণ প্রক্রিয়া। প্ল্যান দালেতের অংশ হিসেবে ফিলিস্তিনে আরব জনগোষ্ঠীকে ক্রমাগত শূন্যের দিকে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করা হয়। সেজন্য ফিলিস্তিনি গ্রাম ও শহরগুলোয় বোমা হামলা ও লুটতরাজ চালিয়ে মানবশূন্য করে ফেলা হয়। যেন নবগঠিত ইহুদি রাষ্ট্রে আরব জনগোষ্ঠী ন্যূনতম হয়।

১৯৪৮ সালের ১৪ মার্চ ব্রিটিশরা তাদের শাসনের অবসান ঘোষণা করে ফিলিস্তিন ত্যাগ করলে ১৫ মার্চ ইজরাইল স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সে ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্র জর্ডান, মিশর, সিরিয়া, ইরাক, লেবানন, সৌদি আরব ইজরাইলের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠায়। আমেরিকা-ব্রিটেনের আশীর্বাদপুষ্ট ইজরায়েলের সাথে শতধাবিভক্ত ও রাজতান্ত্রিক আরব বিশ্বের যুদ্ধে পেরে উঠা সম্ভব হয়নি। সে যুদ্ধে ইজরায়েল জয়ী হয়ে জাতিসংঘ প্রস্তাবিত ভূমির থেকে অনেক বেশি জায়গা, প্রায় ৭৭% এলাকা দখল করে নিয়েছিল। জর্ডান ফিলিস্তিনের পূর্ব জেরুজালেমসহ পশ্চিম তীর এবং মিশর গাজা এলাকা দখল করে। ইসরাইলের নিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে উচ্ছেদ হয়ে প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ ফিলিস্তিনি পশ্চিম তীর, গাজাসহ পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্রগুলোর শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়।
জায়োনিস্টদের দাবি অনুযায়ী ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনিরা স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছিল। কিন্তু 'দ্যা এথনিক

ক্লিনজিং অব প্যালেস্টাইন' নামক বইয়ে আইলান পেপে দেখিয়েছেন এথনিক ক্লিনজিং বা জাতিগত নিধনের কারণেই স্থানীয় ফিলিস্তিনিরা চলে গিয়েছিল। ফিলিস্তিনিরা যেটাকে বলে 'নাকবা' বা বিপর্যয়। এর সত্যতা মেলে ইসরায়েলের সবচেয়ে বেশি সময়ের ও প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়ান-এর লেখায়। তিনি ১৯৩৭ সালেই লিখেছিলেন 'আরবদের অবশ্যই চলে যেতে হবে। এ জন্য একটা সুযোগময় মুহূর্ত সৃষ্টি করতে হবে। যেমন একটি যুদ্ধ।' তিনি কঠোর নির্দেশনা জারি করেছিলেন এই বলে, 'প্রতিটি আক্রমণ শেষ হতে হবে দখল, ধ্বংস ও বিতাড়ন দিয়ে। অন্যদিকে কীভাবে ফিলিস্তিনিদের বিতারণ করা হয়েছিল, তার প্রমাণ মেলে ইজরায়েলি যুদ্ধবীর মোশে দায়ান-এর লেখায়, 'আরব গ্রামগুলোর স্থলে ইহুদিদের গ্রাম গড়ে উঠেছে। আপনি ওসব আরব গ্রামের নাম জানবেন না। কেননা, সেগুলোর আর কোনো অস্তিত্বই নেই। এই দেশে এমন একটি স্থানও নেই, যেখানে আগে আরবরা থাকত না।' গত ৭৩ বছর ধরেই সে নিশ্চিহ্নকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

নিজ দেশে উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনিদেরও উচ্ছেদ করতে চায় ইজরাইল

১৯৬৭ সালে পুনরায় আরব-ইসরাইল ছয়দিনের যুদ্ধের পর ইজরায়েল মিশরের কাছে থেকে সিনাই ও গাজা, জর্ডানের কাছ থেকে জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম এবং সিরিয়ার কাছ থেকে গোলান উপত্যকা দখল করে নেয়। ক্যাম্প ডেভিড শান্তি চুক্তির পর মিশর সিনাই ফেরত পায়, বাকি অংশ ইজরায়েলের দখলে থেকে যায়। ১৯৬৭ সালের পর থেকে গাজা এবং পূর্ব জেরুসালেমসহ পশ্চিম তীর এলাকা ইজরায়েল দখল করে রেখেছে। ইজরায়েলের লক্ষ্য হচ্ছে গাজা ও পশ্চিম তীরকে ইজরায়েলে বিলীন করে দেওয়া। এইজন্য অধিকৃত এলাকায় ইজরায়েল জোরপূর্বক বা আইনি প্রক্রিয়ায় ইহুদি বসতি স্থাপন ও ফিলিস্তিনিদের জীবন দুর্বিষহ করা অব্যাহত রেখেছে। দখলকৃত ভূ-খণ্ড ইজরায়েলে বিলীন করতে গেলে আন্তর্জাতিক নিন্দা ও চাপের মুখে পড়তে হয়। সেজন্যে তারা গ্রহণ করে গোপনে সংযোজন (ক্রিপিং এনেক্সেজেশন) নীতি। ১৯৭০-এর দশকে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দায়ান তাই ফিলিস্তিনিদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'তোমরা কুকুরের মতো বেঁচে থাকবে আর যখন ইচ্ছে চলে যেতে পারো। আমরা দেখব পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে ঠেকে। ... পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা হয়তো দুই লাখ মানুষ কম পাব, আর তা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ'।

গোপনে সংযোজন নীতি বাস্তবায়নও সহজ ছিল না। আন্তর্জাতিক আইন সে ক্ষেত্রে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ২০০৮ সালে ব্রিটিশ সাংবাদিক জোনাথন কুক 'ডিজঅ্যাপিয়ারিং প্যালেস্টাইন: ইসরায়েল'স এক্সপেরিমেন্ট ইন হিউম্যান ডিসপেয়ার' নামে একটি বই লেখেন। এতে জোনাথন কুক লিখেছেন, "সামরিক দখলদারির ক্ষেত্রে অধিকৃত ভূ-খণ্ডের বেসামরিক জনগণের অধিকার হেগ রেজল্যুশন ও চতুর্থ জেনেভা কনভেনশন দ্বারা সুরক্ষিত। এসব কনভেনশনের দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো: অধিকৃত ভূ-খণ্ডে দখলদার রাষ্ট্র নিজেদের জনগণকে স্থানান্তর করতে পারবে না এবং অধিকৃত ভূ-খণ্ডের বিদ্যমান আইন মানতে হবে। এর উদ্দেশ্য হলো দখলকৃত ভূ-খণ্ডের রাজনৈতিক, জনসংখ্যাগত ও ভৌত বাস্তবতা নিজেদের অনুকূলে পরিবর্তন করা থেকে দখলদারি শক্তিকে বিরত রাখা। কিন্তু ইসরায়েলের তো এসব কাজই করা দরকার। কেননা, পশ্চিম তীর ও গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের বিতাড়িত করে এই ভূ-খণ্ডগুলো বৃহত্তর ইসরায়েলে বিলীন করতে হবে। ..." (পৃ. ৬১-৬২)। ইজরায়েল জেনেভা কনভেনশনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেনি, তারা নিজেদের মতো আইন তৈরি করে আইনি মারপ্যাঁচ দিয়ে ফিলিস্তিনি জমি, রাস্তাঘাট, জলাধারগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। ১৯৪৮ সালে নাকবার সময় ফিলিস্তিনিদের ফেলে যাওয়া জমি পরিত্যক্ত দেখিয়ে অধিগ্রহণ করে ইজরায়েল। বলপূর্বক জমি দখল অপেক্ষা আইনি মারপ্যাঁচ কাজে লাগিয়ে জমি গ্রহণ কম নিন্দনীয়–এই নীতি কাজে লাগিয়ে ইজরাইয়ল আইন প্রণয়ন করে।

ইতোমধ্যে পশ্চিম তীরের প্রায় ৩০% এলাকায় ইহুদি বসতি স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে বসবাসরত ৩০ লাখ ফিলিস্তিনিদের মাঝে মাঝে প্রায় ৬ লাখ ইহুদি সেটেলার বসানো হয়েছে। ছিটমহলের মতো এসব ইহুদি বসতিগুলোর মধ্যে যোগাযোগের জন্য আলাদা সড়ক নেটওয়ার্ক ও নিরাপত্তার জন্য সামরিক অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। ফিলিস্তিনিরা এইসব সড়ক অতিক্রম করতে হলে ইসরাইলি সামরিক চেকপোস্টের অনুমতি লাগে। এর ফলে ফিলিস্তিনি গ্রাম ও শহরগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এর ওপর জেরুজালেমসহ ইসরাইলি ভূ-খণ্ড ও অধিকৃত পশ্চিম তীরের মাঝে নির্মাণ করা হয়েছে প্রায় ৭০০ কিমি দীর্ঘ ও ২৫ ফিট উঁচু সীমানা দেয়াল। আঁকাবাঁকা এই সীমানা দেয়াল পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনি এলাকাগুলোকে আরও খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং ফিলিস্তিনিদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত করে ফেলেছে। গাজায়ও ইহুদি বসতি স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু হামাসের সশস্ত্র তৎপরতায় নিরাপত্তহীনতার কারণে ও আন্তর্জাতিক চাপে ২০০৪ সালে সেখান থেকে ইহুদি বসতি ও ইজরাইলি নিরাপত্তা বাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ফলে গাজার ভেতরে ফিলিস্তিনিরা অনেকটা ইজরাইলের নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবস্থায় বসবাস করছে। ২০০৬ সাল থেকে গাজাকে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে ইজরাইল ও মিশর। ফলে গাজায় অর্থনৈতিক সংকট, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব ও বেকারত্ব তীব্র। তার সাথে কয়েকবছর পরপর সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে গাজাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে ইজরাইল।

আসলে ইজরাইল ক্রমাগত অবরোধ-আক্রমণ-হত্যা চালিয়ে কী করতে চায়? ইজরাইলি সমাজবিজ্ঞানী বারুখ কিমমারলিংকে উদ্ধৃত করে জোনাথন কুক লিখেছেন, 'প্রথমত, ফিলিস্তিনের নেতাদের ও বস্তুগত অবকাঠামোসহ গণবলয় ধ্বংস করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিবলয় ও যেকোনো স্বাভাবিকতা ও স্থিতিশীলতার সম্ভাবনা ধ্বংস করে দিয়ে ফিলিস্তিনিদের প্রাত্যহিক জীবন উপর্যুপরি অসহনীয় করে তোলা। ... এ সবকিছুই নকশা করা হয়েছে ফিলিস্তিনিদের প্রত্যাশা নামিয়ে আনার, তাদের প্রতিরোধ গুড়িয়ে দেওয়ার, পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করার, ইজরাইলিদের কথামতো যেকোনো ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার এবং সর্বোপরি এই ভূমি থেকে স্বেচ্ছায় গণহারে অভিবাসী হওয়ার জন্য' (পৃ. ১৩৩)। সাম্প্রতিক সময়ে ইজরাইল-প্যালেস্টাইন সংকটের মূলেও ছিল ইজরাইলের দখলী মনোভাব ও এর বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলন।

ইহুদি-মুসলমান ধর্মযুদ্ধ নয়, চাই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বৈশ্বিক সংগ্রাম ও সংহতি

প্যালেস্টাইন-ইজরাইল সংঘাতকে মুসলমান ও ইহুদিদের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ হিসেবে দেখার প্রবণতা আমাদের দেশে ব্যাপকভাবেই আছে। আমেরিকা যখন ইরাকে বা আফগানিস্তানে হামলা চালায় তখন মৌলবাদীরা একে মুসলিমদের ওপর খ্রিস্টানদের হামলা হিসেবে দেখায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই ভুল। মধ্যপ্রাচ্যের তেল-সম্পদের ওপর দখল প্রতিষ্ঠা ও এই অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই ইরাক-লিবিয়া-সিরিয়ায় হামলা, একই উদ্দেশ্যে ইসরাইলকে সমর্থন। অন্যদিকে ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সারা দুনিয়ার বিবেকবান মানুষ ফিলিস্তিনিদের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন করছে এবং ইজরাইলি বর্বরতা ও দখলদারিত্বের প্রতিবাদে রাস্তায় নামছে। ইসরাইলি শাসকদের প্রবল জাতিগত ও ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির চেষ্টার মধ্যেও ইহুদি জনগোষ্ঠীর মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মানুষেরা আছেন। সংখ্যায় কম হলেও খোদ ইজরাইলে গাজায় পরিচালিত গণহত্যার বিরুদ্ধে সেখানকার বামপন্থী দল, যুদ্ধবিরোধী সংগঠন, ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক সংগঠন বিক্ষোভ করছে, বরং তথাকথিত 'মুসলিম উম্মাহ' এক্ষেত্রে প্রায় নীরব। ইজরাইলকে সাথে নিয়ে ইউরোপ-আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারকে আড়াল করতে সংকটটাকে ধর্মের মোড়কে সামনে আনলে সাম্রাজ্যবাদীদের জন্যে সুবিধাজনক। ইহুদিদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনাকে কাজে লাগিয়ে ইজরাইলের বিরুদ্ধে তৎপরতাকে এন্টি-সেমিটিক লেবেল এটে দেওয়া সহজ।

মুখে আমাদের সরকার ফিলিস্তিনের সমর্থন ও ইজরাইলের বিরোধিতা করলেও প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশ সরকার ইজরাইলের বিরুদ্ধে যথাযথ অবস্থান নেয় না। সম্প্রতি পাসপোর্ট থেকে ইজরায়েল গমনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার মধ্য দিয়ে ইজরাইলের প্রতি আমাদের সরকারের মনোভাব প্রকাশ পায়। আবার ইজরাইল যাদের শক্তিতে এত শক্তিশালী হয়েছে সে আমেরিকার বিরুদ্ধে আমাদের সরকার কোনো কথা বলতে রাজি না। উলটো আমেরিকার সুদৃষ্টি আশা করে আমাদের সরকারগুলো। আমাদের ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে দীর্ঘদিনের ব্রিটিশ বিরোধী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই। ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের পর আমাদের স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী লড়াই করে আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম। স্বভাবতই আমাদের দেশের জনগণ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা ধারণ করে। সেজন্যে এমনকি আমাদের সংবিধানেও ঘোষণা করা হয়েছিল – বাংলাদেশ সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবে। সেজন্যে বাংলাদেশ সবসময় ফিলিস্তিনের পক্ষে এবং জায়োনিস্ট ইজরাইলের বিপক্ষে। কিন্তু শাসকশ্রেণি আর জনগণ এক বিষয় না।

সাম্রাজ্যবাদকে রুখে দিতে না পারলে ফিলিস্তিনের যেমন মুক্তি নাই, তেমনি আমাদের মতো সাম্রাজ্যবাদের শিকার দেশগুলোরও মুক্তি নেই। সেজন্যে আমাদের ইজরায়েল-আমেরিকার বিরুদ্ধে জোরালো জনমত তৈরি করতে হবে। ফিলিস্তিনের পক্ষে ও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে আমাদের সরকারকেও বাধ্য করতে হবে। ফিলিস্তিনের মার্ক্সিস্ট বিপ্লবী ঘাসসান ফাইয়াজ কানাফানি বলেছিলেন, "The Palestinian cause is not a cause for Palestinians only, but a cause for every revolutionary, wherever he is, as a cause of the exploited and oppressed masses in our era ..."। সারা পৃথিবীর সংবেদনশীল মানুষ সেজন্যে ফিলিস্তিনের পক্ষে। এমনকি ইজরায়েলের অনেক ইহুদিরাও জায়োনিজমকে ঘৃণা করেন। এবারের সংকটে ব্যাপকভাবে ইজরাইলি আরবদের আন্দোলনে নামাও আমাদের আশাবাদী করে।

স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র চাই

ইজরাইল রাষ্ট্র ঘোষণার সময় বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ করা সাড়ে ৭ লক্ষ ফিলিস্তিনির নিজ ভূমিতে ফেরার অধিকারকে সমর্থন করে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের আরব-ইজরাইল যুদ্ধের পর থেকে ইজরাইল কর্তৃক অধিকৃত এলাকা থেকে ইজরাইলি সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান সম্বলিত প্রস্তাব পাশ হয়। কিন্তু এর কোনোটিই মানতে ইজরাইলকে বাধ্য করা যায়নি নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন ভেটোর কারণে। ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের যুক্ত মোর্চা পিএলও-র নেতা ইয়াসির আরাফাত ১৯৯৩ সালে স্বাক্ষরিত

● ৬ এর পাতায় দেখুন

সাম্যবাদ

বাজেট ২০২১-২২: টাকা দেয়

হিসেবেই এ রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে। আওয়ামী লীগ জনগণের বিনা ভোটে ক্ষমতা আঁকড়ে আছে এবং আরও দীর্ঘ সময় থাকতে চায়। ফলে তাকে দেশি-বিদেশী পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী, আমলা, সামরিক বাহিনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী – এদের যেকোনোভাবে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, নিরাপত্তা বাহিনী এদের জন্য বিশাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আর বড় ব্যবসায়ীদের নানা ছাড় দিয়েছে মুক্তহস্তে।

আগেই বলা হয়েছে, ব্যবসায়ীদের জন্য কর্পোরেট কর কমানো হয়েছে। পোশাকশিল্পের মালিকদের গত কয়েক বাজেটে একের পর এক ছাড় দেওয়া হয়েছে। এবারও পোশাকশিল্পে বিদ্যমান প্রণোদনার সাথে ১% হারে অতিরিক্ত রপ্তানি প্রণোদনা সুবিধা দেওয়া হয়েছে। শিল্পে কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর ৪% থেকে কমিয়ে ৩% করা হয়েছে। অটোমোবাইল থ্রি হুইলার ও ফোর হুইলার উৎপাদনকারী কোম্পানিকে মোট ২০ বছরের কর অব্যাহতি বা ট্যাক্স হলিডে দেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীদের বছরে ৩ কোটি টাকা টার্নওভারে শতকরা ৫০ ভাগ থেকে ২৫ ভাগে নামিয়ে নতুন কর প্রস্তাব করা হয়েছে। ব্যবসায়ীরা কর ফাঁকি দিলে পূর্বে যে জরিমানা ছিল, তাও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেওয়া হয়েছে আরও ছাড়। ব্যবসায়ীরা খুব খুশি, তারা বাজেটকে 'ব্যবসাবান্ধব' বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। অর্থমন্ত্রী নিজেই বাজেটকে 'পুরোই ব্যবসাবান্ধব' বলে অভিহিত করেছেন। বলেছেন প্রয়োজনে আরও করছাড় দেওয়া হবে। সাংবাদিক কামাল আহমেদ পরিস্থিতিটা চমৎকার করে তুলে ধরেছেন অল্প কথায় – "'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' উপকথাই এখন আমাদের একমাত্র অগ্রাধিকার। বাজেট বিশ্লেষণে যে কথা ঘুরেফিরে উচ্চারিত হয়েছে, তা হচ্ছে এটি একটি ব্যবসাবান্ধব বাজেট। পেশার দিক থেকে সাংসদদের মধ্যে ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে বেশ আগেই। মন্ত্রীদের মধ্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। সুতরাং, ব্যবসাবান্ধব না বলে এখনকার বাজেটকে ব্যবসায়ীদের বাজেট বললেও কোনো অতিরঞ্জন বা তথ্যবিকৃতি ঘটে না। অবশ্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা যে ব্যবসায়ীদের এই সংজ্ঞায় পড়েন না, সে কথাও বলে নেওয়া জরুরি।" (কামাল আহমেদ, ৮ জুন, প্রথম আলো)

প্রাধান্য দাবি করা হলেও বাজেটে জীবন-জীবিকা উপেক্ষিত

অর্থমন্ত্রী এবারের বাজেটের শিরোনাম দিয়েছেন – 'জীবন জীবিকায় প্রাধান্য দিয়ে সুদৃঢ় আগামীর পথে বাংলাদেশ'। করোনা মহামারীর মধ্যেই দ্বিতীয় বাজেট বলে জীবন-জীবিকায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলে অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন। অথচ জীবন ও জীবিকা রক্ষার বাজেট বলে যতই ঢোল পেটানো হোক, বাজেটে তার ন্যূনতম প্রতিফলন নেই। করোনা মহামারীতে জীবন রক্ষার জন্য ভগ্ন স্বাস্থ্যখাতকে ঢেলে সাজানোর কোনো পরিকল্পনা ও সে অনুযায়ী সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের বরাদ্দ নেই। ১৭ কোটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য খাতে বাজেটের মাত্র ৫.৪% বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যা প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দের (৬.২%) চেয়েও কম। গত বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ ছিল জিডিপির ১.২%, এবার তা কমে জিডিপির ০.৯৫ %-এ নেমে এসেছে। স্বাস্থ্যখাতে এ সামান্য বরাদ্দ নিয়েও কি পরিমাণ হরিলুট হয়, তা যেকেউ জানেন। লুটপাট-দুর্নীতির পাশাপাশি বরাদ্দের একটা বড় অংশ যে জনগণের জন্য খরচ হবে না, তাও বিগত বাজেটে স্পষ্ট। গত ১০ মাসে চলতি বাজেটের মাত্র ২৫ শতাংশ ব্যয় করতে পেরেছে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ। অথচ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী, স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হতে হবে জিডিপির ৫ শতাংশ ও মোট বাজেটের ১৫ শতাংশ। করোনা মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউ চলছে, তৃতীয় ঢেউ আসবে, তা কিভাবে মোকাবেলা করা হবে, বাজেটে তার কোনো পরিকল্পনা নেই। অর্থমন্ত্রীর পরিকল্পনামতো প্রতিমাসে ২৫ লাখ করে টিকা দিলেও, ৮০ ভাগ জনগোষ্ঠীকে টিকা দিতে চার বছর লেগে যাবে। জনগণের স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বরাদ্দ কমায় রোগীদের চিকিৎসা ব্যয় বাড়ছে। বাংলাদেশে একজন রোগীকে চিকিৎসা ব্যয়ের ৭৪ শতাংশ মেটাতে হয় নিজের পকেটের পয়সায়, যা ২০১২ ছিল ৬৪ শতাংশ। বর্তমানে সরকার ব্যয় করে মাত্র ২৬ শতাংশ। যার ফলে চিকিৎসাব্যয় মেটাতে গিয়ে প্রতিবছর বাংলাদেশের ১ কোটি ১৪ লাখের বেশি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে নেমে যাচ্ছে। বেসরকারি চিকিৎসাই এখন দেশের প্রধান খাত। সরকারি হাসপাতালে পর্যাপ্ত শয্যা নেই, আইসিইউ নেই, ভেন্টিলেটর নেই, সেন্ট্রাল অক্সিজেন সরবরাহ নেই, পর্যাপ্ত ডাক্তার-নার্স-টেকনিশিয়ান নেই। বাজেটে ১০ হাজার কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেওয়া হলেও, কীভাবে ব্যয় হবে, তার নির্দেশনা নেই। স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান গবেষণার জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বিগত বাজেটেও এ জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু নীতিমালা প্রণয়ন করতে করতেই একবছর পার করে দেওয়া হলো, গবেষণার জন্য কোনো অর্থ খরচ হয়নি। জীবিকা রক্ষার জন্য বাজেটে সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা নেই। সারা দেশে (প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের) ১ কোটি ৪৪ লাখ কর্মী কাজ হারিয়েছেন অর্থাৎ এখনও কাজে ফিরতে পারেননি। যারা কাজ পেয়েছেন, তাদের আবার আয় কমেছে। জরিপে দেখা যাচ্ছে, ৫২ শতাংশ মানুষের খাদ্য গ্রহণ কমেছে। জাতীয়ভাবে মাথাপিছু আয় বাড়লেও শ্রমজীবীদের মাথাপিছু ঋণ বেড়েছে। এ কর্মহীন ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির কোনো পরিকল্পনা নেই। কাজ হারিয়ে প্রায় ৫ লক্ষ প্রবাসী শ্রমিক দেশে ফিরতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু দেশে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির কোনো পরিকল্পনা বাজেটে নেই।

করোনায় বিপর্যস্ত শিক্ষাখাতে কী পেল

শিক্ষাখাতে করোনার কারণে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, সে ক্ষতি পোষাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নেই। শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবিতেও প্রতারণা আছে। শিক্ষাখাতে বরাদ্দের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দও ঢুকিয়ে দিয়ে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে মোট বরাদ্দ ১৫.৭২% দেখানো হচ্ছে। এর মধ্য রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ ১৮ হাজার ৪২৬ কোটি ১৬ লাখ টাকাও অন্তর্ভুক্ত। আলাদাভাবে শিক্ষাখাত হিসাব করলে বরাদ্দ বাজেটের মাত্র ১১.৯২%। জিডিপিতে বরাদ্দ ২%-এর বেশি হবে না। অথচ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ আফগানিস্তানও শিক্ষাখাতে জিডিপির ৪.১%, দরিদ্র ভুটান জিডিপির ৭% শিক্ষাখাতে ব্যয় করে। জিডিপিতে বরাদ্দের দিক হতে বাংলাদেশ ১৯৩টি দেশের মধ্যে ১৯২ তম। দেশের দরিদ্র মানুষের সন্তানেরা যে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ে, তার হাল সবার জানা। পাবলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাবে দেশের মধ্যবিত্ত, এমনকি নিম্নবিত্ত পরিবারগুলো বাধ্য হয়ে, প্রয়োজনে জমিজমা বিক্রি করে হলেও সন্তানদের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াচ্ছে। শিক্ষার এ বাণিজ্যিক ধারাকে সংকুচিত করা দূরে থাক, সরকার এ শিক্ষার্থীদের উপর বাজেটে ১৫% ভ্যাট আরোপ করেছে। করোনার কারণে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নান এমপিওভুক্ত ১০ লাখ শিক্ষক, কিন্ডারগার্টেনের ৬ লাখ ও বেসরকারি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আড়াই লাখ শিক্ষকের জন্য কোনো প্রণোদনা নেই। একটি বেসরকারি সংস্থার গবেষণা অনুযায়ী, পরিবারের আয় কমে যাওয়ার কারণে প্রায় ৪০% শিশু শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে ঝরে পড়বে। গত বছরের তুলনায় এবছর এক তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থীও ভর্তি হয়নি। ঝরে পড়া থেকে রক্ষা করতে শিক্ষার্থীদের বেতন ফি মওকুফের জন্য কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি।

অর্থনীতির চাকা ঘোরানো মানুষগুলো চাকার নিচেই থাকুক

কৃষক ও কৃষিশ্রমিক, গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক এবং লক্ষাধিক প্রবাসী শ্রমিক-এদের শ্রমে-ঘামেই ঘুরছে বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা। অথচ এরাই রাষ্ট্রের সবচেয়ে অবহেলার শিকার, বাজেটে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। দেশের ১৭ কোটি মানুষের খাদ্যের যোগান দেওয়া ও ৪০ ভাগ কর্মসংস্থানসহ বিশাল অংশের মানুষ যে খাতের উপর নির্ভরশীল, সে কৃষি খাতে বাজেটের মাত্র ৫.৩% বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কৃষক সংগঠনের দীর্ঘদিনের দাবি উন্নয়ন বাজেটের ৪০ ভাগ কৃষিখাতে বরাদ্দ করা। অথচ এবার উন্নয়ন বাজেটের মাত্র ৩.৪১% বরাদ্দ করা হয়েছে। কৃষকের ঘামে-শ্রমে খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে, অথচ কৃষক ফসলের ন্যায্যমূল্য পায় না। কৃষক থেকে সরাসরি ফসল কেনার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নেই। বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকরা করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদন চালু রাখলেও, নেই কোন ঝুঁকি ভাতা, ক্ষতিপূরণ, প্রণোদনার জন্য বাজেটে কোনো বরাদ্দ নেই। গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির কোনো পরিকল্পনা নেই। বন্ধ হওয়া পাটকল, চিনিকল শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের কোনো আয়োজন নেই। করোনাকালে চাকরি হারিয়ে দেশে আসা ৫ লাখ প্রবাসী শ্রমিকের পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানে কোনো বরাদ্দ নেই।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বেশি দেওয়ার দাবি করা হচ্ছে। অথচ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী পেনশনভোগীর পেনশন সামাজিক নিরাপত্তা খাতের সাথে যুক্ত করে দিয়ে, সামাজিক নিরাপত্তা খাতকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হচ্ছে। এ খাতের ১ লাখ ৭ হাজার ৬১৪ কোটি টাকার মধ্যে ৩০ হাজার কোটি টাকাই ব্যয় হবে সরকারি কর্মচারীদের পেনশন খাতে। করোনার কারণে নতুন করে দরিদ্র হয়েছেন ২ কোটি ৪৫ লাখ মানুষ। নতুন দরিদ্র হওয়া মানুষদের জন্য বাজেটের সামাজিক নিরাপত্তা খাতে কোনো বরাদ্দ নেই।

এদিকে মানুষের আয় কমে গিয়েছে,অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সংসারের ব্যয় বাড়ছে। মূল্যবৃদ্ধির খড়গ থেকে জনগণকে বাঁচাতে দরকার সরকারি সংস্থা টিসিবির মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি বাজার নিয়ন্ত্রণ, নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য আর্মি রেটে রেশনের ব্যবস্থা করা। সেজন্য টিসিবিকে প্রয়োজনীয় জনবল ও বরাদ্দ দিয়ে সক্রিয় করার লক্ষে বাজেটে কোনো পরিকল্পনা ও বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ সারা বছর মূল্যবৃদ্ধির যাঁতাকলেই মানুষ পিষ্ট হতে থাকবে। আর সরকার টিসিবিকে সক্রিয় করার সে ভাঙা রেকর্ড বাজাতেই থাকবে!

জিডিপি উচ্ছ্বাস ও বাস্তবতা

জিডিপির প্রবৃদ্ধি ঘটা সত্ত্বেও, কর্মসংস্থান হচ্ছে না। এজন্য দেশের অনেক অর্থনীতিবিদ এর নাম দিয়েছেন – কর্মসংস্থানহীন প্রবৃদ্ধি। কাজের অভাবে তরুণ-যুবকরা সাগরে হাজারে হাজারে ডুবে মরছে, অনেকের ঠাঁই হচ্ছে থাইল্যান্ড-মালেশিয়ার গণকবরে, কোনো জঙ্গলের বন্দিশিবিরে বা বিভিন্ন দেশের কারাগারগুলোতে। চাকরি দেওয়ার নাম করে নারীদের পাচার করে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন দেশের পতিতালয়ে। কাজ নেই, সে দেশেই আবার কর্মসংস্থানের একটা ক্ষেত্র পাটকলসহ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। বরং সংবিধান বর্ণিত কর্মসংস্থানে সৃষ্টিতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব অস্বীকার করা হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতাতেও বললেন, সরকার কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবে না। বলা হচ্ছে আইটি খাতে ১০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে, কিন্তু কীভাবে তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য কৃষিভিত্তিক শিল্প-কারখানা স্থাপনের কোনো পরিকল্পনাও নেই।

প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর নেশায় মেগা-লুটপাটের মেগা প্রকল্পগুলোর জন্য বিশাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। উন্নয়ন বাজেটের ২৫ ভাগ মেগাপ্রকল্পগুলোতে ব্যয় হবে। বড় বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সড়ক যোগাযোগ খাতে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে। রূপপুর, পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প ইত্যাদি খাতে কী পরিমাণ দুর্নীতি-লুটপাট চলছে, তা করো অজানা নয়। সে কারণেই প্রকল্পগুলোর ব্যয় ক্রমাগত বাড়ছে। প্রতি কিমি রাস্তা, রেলপথ, সেতু, ফ্লাইওভার নির্মাণের খরচ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি। প্রতিবছর জনগণের করের টাকা লুটপাটের এ কার্যক্রমকে বাজেটে বৈধতা দেওয়া হয়, এবারের বাজেটও তার ব্যতিক্রম নয়। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব ব্যয় ও উন্নয়নপ্রকল্পের প্রতিটা ক্ষেত্রে মহালুটপাট, দুর্নীতির মহোৎসব চলছে। নদী-খাল দখল, ভূমি দখল, পাহাড় দখল, শ্রমিক শোষণ, কর ফাঁকি, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে লোপাট, পুরো ব্যাংক লোপাট, চোরাচালান, মাদকব্যবসা, মানবপাচার, সিন্ডিকেট করে রাতারাতি অস্বাভাবিক মুনাফা ইত্যাদি অবাধে চলছে। খেলাপী ঋণ ও কালো টাকা বাড়ছে। ফলে করোনার মধ্যেও বাড়ছে কোটিপতির সংখ্যা, বাড়ছে আয় বৈষম্য। সাথে বাড়ছে সম্পদ পাচার। এবং তা চলছে সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয়েই। সেজন্যই কারা সম্পদ পাচার করছে, সরকারি সংস্থা সে সুনির্দিষ্ট তথ্য সরকারকে দিলেও, অর্থমসমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে দিব্যি বলছেন – কারা সম্পদ পাচার করছে, তার জানা নেই। বারে বারে সুযোগ দেওয়া হয় কালো টাকা সাদা করার। এবারও সরকার কালো টাকার মালিকদের অবৈধ আয়কে বাজেটে বৈধতা দিয়ে লুটপাটের অর্থনীতিকেই শক্তিশালী করলেন।

উপরের আলোচনাতেই স্পষ্ট, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার প্রণীত ২০২১-২২ সালের বাজেট ব্যবসায়ী ও ধনীদের তুষ্ট করার বাজেট। দেশের সংখ্যাগরিষ্ট শ্রমজীবী, নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত সাধারণ জনগণের জন্য স্বাস্থ্য-শিক্ষা-কর্মসংস্থানের দাবি উপেক্ষিত হয়েছে। দেশের প্রচলিত লুটপাটের অর্থনীতির ধারাই এ বাজেটের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হবে। আমরা দাবি জানাই, জনগণের করের টাকা থেকে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় কমিয়ে জনগণের স্বাস্থ্য-শিক্ষা-কর্মসংস্থান-কৃষিসহ উৎপাদনশীল খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

কোভিড ভ্যাক্সিন

অনেক দেশ বিনামূল্যে ভ্যাক্সিনের ব্যবস্থা করলেও মুক্ত বাজার অর্থনীতির ধ্বজাধারী অনেক দেশে বেসরকারিভাবে ভ্যাক্সিন বিক্রি হচ্ছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে যেখানে প্রতিদিন অক্সিজেন সংকটে মানুষ মারা যাচ্ছে, সেখানে টিকার দাম ২৫০ রুপি নির্ধারণ হলেও তা বিক্রি হচ্ছে ৬০০/৭০০ রুপিতে। ভারতে বায়োটেকের তৈরি কোভ্যাক্সিনের ডোজ বিক্রি হচ্ছে ১২০০ থেকে ১৫০০ রুপিতে।

করোনা মহামারীতে যখন মানুষের জীবন বিপর্যস্ত, তখনি কয়েকটি ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানির একচেটিয়া মুনাফার পণ্য হয়েছে এই ভ্যাক্সিন। করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তির জন্য সারাবিশ্বের বিজ্ঞানীরা প্যাটেন্ট বা ইন্টিলেকচুয়াল প্রোপার্টি (মেধাসত্ত্ব) রাইট করোনা পরিস্থিতিতে তুলে দেওয়ার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। ভ্যাক্সিনের প্রোপার্টি রাইট তুলে নেওয়া হলে বা এর ফর্মুলা উন্মুক্ত করে দিলে, অনেক দেশই ভ্যাক্সিন উৎপাদন করে দ্রুতই সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষকে টিকার আওতায় আনতে পারত। এক হিসেবে বলছে, এভাবে ভ্যাক্সিনেশন হলে ২০২২ সালের মধ্যে ৬০% মানুষ ভ্যাক্সিনের আওতায় আসবে।

যখন সারাবিশ্বে একটা বৈশ্বিক মহামারী, ভারতের রাজধানী দিল্লিতে রাস্তায় রাস্তায় মানুষ মরে আছে, শ্মশানে জায়গা হচ্ছে না, তখন প্রোপার্টি রাইটের প্রয়োজন কার স্বার্থে? তাহলে যে গবেষণা করা হচ্ছে, তা হাতে গোনা ৪/৫টা কোম্পানির লাভের জন্য নাকি সারাবিশ্বের মানুষের কল্যাণে জন্য? যদি কিছু কোম্পানির স্বার্থে গবেষণা হয়, সে গবেষণা দিয়ে মানব জাতির কী লাভ! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্যাটেন্ট করা পেনিসিলিন উন্মুক্ত করে দিয়ে অনেক মানুষের জীবন বাঁচিয়েছিল। চাল-ডালের মতো ভ্যাক্সিন যখন বাজারের পণ্য, তখন মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে 'টাকা যার ভ্যাক্সিন তার'–এই নীতিই চলবে সেটাই স্বাভাবিক।

সর্বশেষে একটা গল্প দিয়ে শেষ করি। মাদাম কুরী ও পিয়েরে কুরী একটি ভাঙা ফুটো টিনের চালের ঘরে সারাদিন পিচব্লেণ্ড জাল দিতেন আর রেডিয়াম নিষ্কাশন করতেন। তাঁরা জানতেন, এই গবেষণায় তাঁদের মৃত্যু হতে পারে। পিয়েরে কুরী ঘোড়ার গাড়ির ধাক্কায় মারা যান। ধারণা করা হয় সেটাও ছিল তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব। রেডিয়াম আবিষ্কারের পর যখন বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য তাঁর কাছে আবেদন আসলো, তিনি সরাসরি নাকচ করে দিয়ে বলেছিলেন, "কারোর ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করা রেডিয়ামের কাজ নয়। রেডিয়াম মৌলিক পদার্থ মাত্র। তার ওপর সবার সমান অধিকার। আমাদের আবিষ্কারের যদি কোনো ব্যবসায়িক সাফল্য থাকে তা আকস্মিক ঘটনামাত্র, তার দ্বারা লাভবান হওয়া আমাদের কখনোই উচিৎ নয়। তাছাড়া চিকিৎসার কাজেই রেডিয়ামের সার্থকতা। এর সুযোগ নেওয়া অত্যন্ত নিচু মনোবৃত্তির পরিচয় হবে।" সেই মাদাম কুরীর আবিষ্কার এখনো মানুষের জীবন বাঁচাচ্ছে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এথিক্স বা নৈতিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন মেরি কুরী। সে বিজ্ঞান আজ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের হিসেবের খাতায় আবদ্ধ।

আর কত কাল ভাসতে

অসলো চুক্তি অনুসারে ইজরাইল রাষ্ট্রকে মেনে নেন, বিনিময়ে ইজরাইল ধাপে ধাপে পশ্চিম তীর ও গাজার সমন্বয়ে ঐতিহাসিক প্যালেস্টাইনের ২২% ভূমি নিয়ে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেয়। এই চুক্তিতে বলা হয় প্রথম ধাপে দখলকৃত এলাকা থেকে ইজরাইলি সেনা ও ইহুদি বসতি প্রত্যাহার করা হবে। কিন্তু ইজরাইল নানা কৌশলে ভূমি দখল করছে ও ইজরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নামে প্যালেস্টাইনিদের ওপর দমন-নির্যাতন চালাচ্ছে। ইজরাইলের পুঁজিবাদী শাসকগোষ্ঠী ও ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো উগ্র জায়নবাদের ভিত্তিতে প্রবল জাতিগত ও ধর্মীয় উন্মাদনা-বিদ্বেষ সৃষ্টিকে ক্ষমতায় যাওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

গত ৭৩ বছর ধরেই বিশ্বরাজনীতিতে ফিলিস্তিন প্রশ্ন বারবার আলোচিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে বারবার ইজরাইলের পক্ষ নিয়েছে। ফিলিস্তিনিদের দীর্ঘ পরাধীনতা, মানবেতর জীবন যাপন, জেলখানার জীবনের অবসানের জন্যে বহু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ওয়ান স্টেট সল্যুশন, টু স্টেট সল্যুশন, গাজাকে মিশরের সাথে-পশ্চিম তীরকে জর্ডানের সাথে একীভূত করে দেওয়া, পূর্বাঞ্চলীয় ফিলিস্তিন, পশ্চিমাঞ্চলীয় ফিলিস্তিন অনেক প্রস্তাবই আলোচনা হয়েছে। যতদিন জায়োনিস্টরা ইজরাইল-এ ক্ষমতায় থাকবে কোনো সমাধানই সত্যিকারের সমাধান হবে না। কেননা জায়োনিস্টরা তাত্ত্বিকভাবেই ইজরাইলকে ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে বজায় রাখতে চায়। প্রাথমিক করণীয় হিসেবে জায়নবাদকে পরাস্ত করতে হবে এবং শেষবিচারে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদকে রুখে দিতে পারলেই কেবল ফিলিস্তিনিদের সত্যিকারের মুক্তি সম্ভব। বাংলাদেশসহ বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের আশু কর্তব্য – নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের রক্ষায় স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ-দখলদারিত্বমুক্ত 'দুই রাষ্ট্র' সমাধানের ভিত্তিতে ফিলিস্তিনে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবিতে সোচ্চার হওয়া।

সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিগুলোর সমর্থনপুষ্ট এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-অর্থনীতি-সামরিক শক্তিতে অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ার পরও একটি ক্ষেত্রে ইজরাইল সহায়-সম্বলহীন ফিলিস্তিনীদের কাছে পরাজিত হয়েছে। শত অত্যাচার ও কূটকৌশল করেও ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার স্পৃহা ও প্রতিরোধের মনোবলকে তারা নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। ফিলিস্তিনি ভূমির জবরদখল বিশ্ববাসীর কাছে এখনো নৈতিক বৈধতা পায়নি। বিশ্বের যেখানে যারা অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে ফিলিস্তিনি জনগণের অদম্য সংগ্রাম তাদের প্রেরণা।

রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্ক : শ্রদ্ধা আর স্নেহের অনন্য নিদর্শন

বাংলা সাহিত্যের প্রধান দুই দিকপাল রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। বাংলা সাহিত্যকে মধ্যযুগের সামাজিক মননকাঠামো থেকে মুক্ত করে ভারতীয় নবজাগরণকে বিরাট বিস্তৃতিতে ছড়িয়ে দিয়েছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর নজরুল সেই ধারারই এক বলিষ্ঠ প্রতিনিধি। দর্শনগত কিছুটা ভিন্নতা সত্ত্বেও এই দুই মানবতাবাদী লেখকের মধ্যে ছিল শ্রদ্ধার-স্নেহের এক মধুর সম্পর্ক, যার ভিত্তি ছিল পরস্পরের গুণের প্রতি স্বীকৃতি ও সমাদর। এ লেখায় ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে সে সম্পর্কের ইতিবৃত্তই তুলে ধরা হয়েছে।

তোমার আলোর রথ চালিয়ে ভাঙব ঘুমের দ্বার

রবীন্দ্রনাথের সাথে নজরুলের বয়সের পার্থক্য ৩৮ বছরের। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ সালে, নজরুলের ১৮৯৯ সালে। নজরুলের শৈশব-কৈশোর কেটেছে পশ্চিমবঙ্গের চুরুলিয়া ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে লেটোগানের আসরে এবং রাণীগঞ্জ, মাথরুন ও দরিরাম-পুরে স্কুলের চৌহদ্দিতে। এ পর্বে তিনি আসানসোলে রুটির কারখানায় এবং ময়মনসিংহের ত্রিশালে পুলিশের দারোগা বাড়িতে কাজ করেন। কাজেই কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু ইতিহাস থেকে জানা যায় – নজরুলের রবীন্দ্র-অনুরাগ তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই।

১৯১৬ সালের ঘটনা। নজরুল তখন বর্ধমান জেলার (এখন পশ্চিম বর্ধমান) রাণীগঞ্জের নিকট সিয়ারসোল হাই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। ওই বয়সেই বাংলা সাহিত্যের অনেক দিকপাল লেখকদের লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর মনে অসীম ভক্তির জন্ম হয়। একবার খেলার মাঠে বন্ধুরা তাঁকে নিয়ে মজা করার জন্য রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে কিছু অপ্রিয় কথা বলায় নজরুল রেগে গিয়ে বাঁশের গোলপোস্ট উপড়ে বন্ধু জগৎ রায়ের মাথায় এমন আঘাত করেছিলেন যে, মাথা ফেটে রক্তপাত হয়েছিল। সে মামলা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

আকৈশোর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অদ্ভুত শ্রদ্ধা নজরুলের। নিজেই লিখেছিলেন, 'বিশ্বকবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা করে এসেছি সকল হৃদয়-মন দিয়ে, যেমন করে ভক্ত তার ইষ্টদেবতাকে পূজা করে, ছেলেবেলা থেকে তাঁর ছবি সামনে রেখে গন্ধ-ধূপ-ফুল- চন্দন দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা বন্দনা করেছি। এ নিয়ে কত লোক কত ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছেন।'

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ১৯২০-এর দিকে নজরুলের যখন আগমন, তখন রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন তাঁর গৌরবের পূর্ণতায়। তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁর প্রভাব প্রায় সবদিকেই। ওই সময় কোলকাতার 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'মোসলেম ভারত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'নবযুগ' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় নজরুলে কবিতা ও অন্যান্য রচনা প্রকাশ হতে থাকে। বিভিন্ন সাহিত্য আড্ডায়ও নজরুল নিয়মিত যেতেন। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

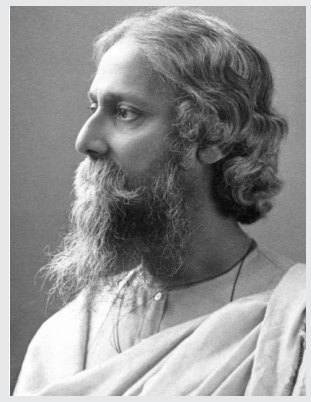

পড়তেন এবং নজরুল সম্পর্কে নিজের আগ্রহের কথা প্রকাশ করতেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও অনেকের কাছে। কবিতাগুলি পড়ে নজরুলের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন কবি। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর আত্মকথা 'চলমান জীবন'-এ শুনিয়েছেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাতের কথা। সত্যেন দত্তকে নজরুল প্রণাম করতে যাওয়ামাত্র 'সত্যেনদা জড়িয়ে ধরেন কাজিকে, বলেন, তুমি ভাই নতুন ঢেউ এনেছ। আমরা তো নগণ্য, গুরুদেবকে পর্যন্ত বিস্মিত করেছ তুমি।' নজরুল বিস্মিত। সত্যেন্দ্রনাথ বলেন, 'গুরুদেবই আমাকে একদিন নিজে থেকে প্রশ্ন করলেন, কাজি নজরুল ইসলামের কোনো কবিতা পড়েছি কি না। তাঁর মতে ভাবের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের সাধনায় এই এক নতুন অবদান আনছ তুমি।' অবশেষে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান নজরুল। যদিও বিস্ময়ের ঘোরে নজরুল কোনো কথাই বলতে পারেননি সেদিন। এরপর থেকে তাদের উভয়ের চিঠি-পত্র আদান-প্রদান হতো নিয়মিত। চিঠি-পত্রে এবং ব্যক্তিগত সম্বোধনে নজরুল রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুজি' বলতেন।

প্রথম দেখার দুই মাস পর ১৯২১ সালের অক্টোবরে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নজরুলের। নিশিকান্ত রায় এই সাক্ষাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'গুরুদেবের পাশে দু'জন আগন্তুক সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তাদের একজনকে অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখিয়ে দিয়ে দাদা সুধাকান্ত আমাকে বললেন, ঐ দেখ কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এই কথা বলে দাদা গিয়ে নজরুলের সান্নিধ্যেই বসলেন। নজরুলের পাশেই ফেজ-পরা, কাঁচা-পাকা দাড়ি নিয়ে একজন বসে আছেন; তিনি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি কবিগুরুকে বলছিলেন, ট্রেনে আসতে আসতে কাজী সাহেব আপনার গীতাঞ্জলির সব ক'টা গান আমাকে গেয়ে শুনিয়েছেন। কবিগুরু বললেন, তাই নাকি? অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি তো! আমার গীতাঞ্জলির গান সবতো আমারই মনে থাকে না।"

'অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে'

নজরুল ছেলেবেলা থেকেই রবি অনুরাগী ছিলেন। নানান জায়গায় তিনি রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে বেড়াতেন। করাচি সেনানিবাসে থাকার সময়েও নজরুল সদাসর্বদা রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন। তিনি ছিলেন রবীন্দ্র-গানের ভাণ্ডারী। সে-কারণে তাঁকে পল্টনের সকলে 'রবীন্দ্র-সংগীতের হাফিজ' বলে ডাকতেন। যুদ্ধের সময় ট্রাংকে থাকতো রবীন্দ্রনাথের গানের বই। দেশে ফিরেই পরিচিত হয়েছিলেন সে সময়কার রবীন্দ্রসঙ্গীতের বড় গায়ক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সাথে। নজরুলের হৃদয়ের কতটা অংশ জুড়ে রবীন্দ্রনাথের গান ছিল তা তাঁর গল্পগ্রন্থ 'ব্যথার দান' ও 'রিক্তের বেদন' এবং 'বাঁধনহারা' পত্রোপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রচুর উদাহরণ দেখলে বোঝা যায়। আরেকবার কোনো এক পত্রিকার সম্পাদক নজরুলের কাছে এসেছিলেন কবিতা নেওয়ার জন্য। তিনি রবীন্দ্র সংগীতের চেয়ে নজরুলের গানের বেশি প্রশংসা করলেন। নজরুল তখন রেগে গেলেন, ধমক দিয়ে বললেন, "আমরা যদি কেউ না জন্মাতাম, তাতে কোনো ক্ষতি হতো না, রবীন্দ্রনাথের গান বেদমন্ত্র, তাঁর গান ও কবিতা আমাদের সাত রাজার ধন মানিক। লেখা নিতে এসেছেন, নিয়ে যান, লেখা নিতে এসে এ রকম আমড়াগাছি যেন আর না শুনি।" নিজের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামও নজরুল রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে নিয়েছিলেন। 'অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে' চরণ থেকেই নজরুল 'অগ্নিবীণা' নিয়েছিলেন।

ঐ নূতনের কেতন ওড়ে

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত রবীন্দ্রনাথের ষাটতম জন্মদিন পালনের সভা হয় ১৯২১-এর ৪ সেপ্টেম্বর। নজরুল সভাকক্ষে ঢুকেই সোজা মঞ্চে উঠে বিশ্বকবিকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মাথায় আশীর্বাদ নিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে যাচ্ছিলেন। মঞ্চ থেকে নামার মুখেই রবীন্দ্রনাথ খপ করে নজরুলের হাত ধরে টানলেন। "না নজরুল, তুমি নিচে নয়, তুমি এই সভায় আমার পাশেই বসবে।" লক্ষণীয়, তখনও নজরুলের প্রথম কবিতার বইটিও বেরোয়নি।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে ১৯২২ সালের ২৫ জুন কলকাতায় রামমোহন লাইব্রেরি হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে স্মরণসভা হয়। সেখানেও নজরুলকে পাশে বসিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এদিন সভায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ধূমকেতুর ম্যানেজার শান্তিপদ সিংহ লিখেছেন, 'বিশ্বকবি মঞ্চে প্রবেশ করলেন এবং প্রায় পিছু পিছু কবি নজরুলও একেবারে মঞ্চের উপর। কবিগুরুর ইঙ্গিতে তাঁর পাশের আসনেই বসলেন। নিচে সেই গুনগুনানি। তাদের হিসাব মতে, কবিগুরুর পাশে বসবার যোগ্যতা নজরুলের নেই। অথচ ঘটনাচক্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের পাশে বসবার সুযোগ পাচ্ছেন বড় বড় সভায়। কি দুর্দৈব!'

-চলবে

কোয়াড, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি

করতে হবে। তাদের এই পুঁজি বিনিয়োগের জন্য চীনকে তার নিভৃতে থাকার কৌশল ত্যাগ করে বিশ্বমঞ্চে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রভাব বিস্তারের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। চীনের Belt and road iniciative হলো তার সেই প্রয়োজনের তাগিদে উদ্ভাবিত কৌশল। Belt and road iniciative কী? সংক্ষেপে যদি বলতে হয় – মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাথে ৪টি করিডোরের মাধ্যমে চীনকে যুক্ত করা। এর মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ করিডোর হলো নৌ করিডোর; যার মাধ্যমে এশিয়া-মধ্যপ্রাচ্য-আফ্রিকার প্রায় অনেকগুলো সমুদ্র বন্দরকে তারা যুক্ত করতে পারবে। যার নাম দেওয়া হয়েছে Chinese String of Pearls। চীনের এই ইনিশিয়েটিভ শুধু অর্থনৈতিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়। সম্প্রতি আফ্রিকার দেশ জিবুতিতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের মধ্য দিয়ে চীন জানান দিয়েছে – নৌ ও সামরিক শক্তিতেও চীন শক্তিশালী। এবং এই সামরিক ঘাঁটিতে যাওয়া-আসার মাধ্যমে পুরো ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর তার নজরদারির মধ্যে থাকবে। এটাই তাদের কৌশল।

এর পাল্টা কৌশল হলো আমেরিকার নেতৃত্বে Indo-pacific strategy। এরই ভূরাজনৈতিক ও সামরিক দিকটা হলো QUAD। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের কতৃত্ব খর্ব করতে ভারত, জাপান, অষ্ট্রেলিয়াকে নিয়ে যে পরিকল্পনা আমেরিকা শানাচ্ছে, তা-ই QUAD। আগে থেকেই ভারত মহাসাগরে দিয়াগো গার্সিয়া দ্বীপে আমেরিকার নৌ ও সেনা ঘাঁটি রয়েছে। এ ঘাঁটির মাধ্যমে আমেরিকা ইরানকে নজরদারির মধ্যে রাখে। ইরাক আক্রমণ এখান থেকেই করা হয়। আবার এর মধ্যে ভারত মহাসাগরে মেরিটাইম ফিউশন সেন্টার (সমুদ্রগামী জাহাজের সমন্বয়ে তৈরি করা) তৈরির পরিকল্পনা করেছে আমেরিকা। এই ডোমেইন ফিউশন তৈরি হলে এটা তার আক্ষরিক কাজের বাইরেও যে অন্য কাজ করবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। চীনের Belt and road iniciative-এর সমুদ্রের যে রুট, সেটা এদিক দিয়েই যাবে। আমেরিকার এই কৌশলের অংশ হতে যাচ্ছে জাপান, ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। চার দেশের এ সম্মিলিত পরিকল্পনাই হলো QUAD।

বাংলাদেশ কীভাবে এই দুই পরিকল্পনার শিকার হবে

বাংলাদেশের স্বার্থ বলি হবে দুই আঞ্চলিক পরাশক্তি ভারত ও চীনের পরস্পরবিরোধী দুই স্বার্থের দ্বন্দ্বে। প্রতিবেশি হওয়ার কারণে শুধু নয়, বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট অনেক বিষয়ে ঐতিহাসিকভাবে ভারতের সাথে বাংলাদেশের একটা সম্পর্ক রয়েছে। কারণ আগেই বলা হয়েছে এই ১০ বছরে চীন শুধু দক্ষিণ এশিয়া বা এশিয়ায় নয়, সারা বিশ্বেই সে পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে নানামাত্রিক প্রভাব সে ইতোমধ্যে তৈরি করেছে। বাংলাদেশে এখন সবথেকে বেশি বিনিয়োগ হলো চীনের। সম্প্রতি চীনের সাথে বাংলাদেশ তিস্তা উন্নয়ন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। যে তিস্তা নিয়ে ভারত বাংলাদেশের সাথে তালবাহনা করেছে।

এগুলো হলো পুরনো কথা। নতুন কথাটা হলো – বৈশ্বিক দুই কৌশলে অর্থাৎ Belt and road iniciative-এ চীন বাংলাদেশকে চায় আর Indo-pacific strategy-তে ভারত-আমেরিকা বাংলাদেশকে চায়। বাংলাদেশ সরাসরি যুক্ত না হলেও অন্তত যেন বাংলাদেশের কাছ থেকে কিছু সুবিধা পায়, এটা দুই শিবিরই চায়। এই দুই অর্থনৈতিক ও সামরিক কৌশলের মারপ্যাঁচে পড়েছে বাংলাদেশ। এ ব্যাপারে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী এবং পত্রপত্রিকার বক্তব্য হলো, বাংলাদেশ বেশ ভালোভাবেই 'দু মেরু রক্ষা' করছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির তারা বেশ তারিফ করছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কাউকে নাক না গলানোর কথা বলে মেরুদণ্ডসম্পন্ন বক্তব্য রেখেছেন বলে অনেকে তারিফ করছেন। অনেকে আবার 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়'–এই কথা বলে স্বস্তি পেতে চান। এই সব প্রত্যেকটা কথা শাসকশ্রেণি আমাদের গেলাচ্ছে। জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ দ্বারা প্রত্যেকটা দেশ তার নিজ নিজ পররাষ্ট্রনীতিকে উচ্চে তুলে ধরে। যদি কখনো জাতীয়তাবাদী সেন্টিমেন্টের ঘাটতি দেখা দেয়, তখন এক দেশ আরেক দেশের উপর আঞ্চলিক যুদ্ধ, জাতিগত সংঘাত, ধর্মীয় সংঘাত ইত্যাদি লাগিয়ে রাখে। এর ফলে জনগণের নিম্ন চেতনার কারণে জাতীয়তাবাদ কিছুদিনের জন্য একটু চাঙ্গা হয়। পুঁজিপতি, সাম্রাজ্যবাদীরা এর মাধ্যমে শোষণকে আড়াল করে।

বাংলাদেশ এই দুই কৌশলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে; কিন্তু মুখে বলছে ভিন্ন কথা

বাংলাদেশ এই দুই কৌশলের কোনোটাতেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে না। বাংলাদেশের এই 'উভয় কূল রক্ষা'র পররাষ্ট্রনীতিকে বুদ্ধিজীবীরা বেশ তারিফ করছেন। কিন্তু আমরা যদি একটু গভীরে দৃষ্টি দিই, তাহলে দেখব, চীন ও ভারতের সাথে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ যে চুক্তিগুলো করেছে, তা এই কৌশলের অংশ। যেমন ২০১৬ সলে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং বাংলাদেশ সফর করেন। তখন স্বাক্ষরিত বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ Belt and road iniciative-এ যুক্ত হয়, তার সফরকালীন মোট ৪০ বিলিয়ন ডলারের ঋণ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। যার মধ্যে ২৬ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয় অবকাঠামো খাতে। অবকাঠামোগুলো হলো পদ্মা রেল সেতু, কর্ণফুলি টানেল, পায়রা সমুদ্রবন্দর, দুটি সাবমেরিন ক্রয় ইত্যাদি। এই সব অবকাঠামো চীনের বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু শাসকশ্রেণি এই অবকাঠামোগত চুক্তিগুলোর থেকে বাণিজ্যিক চুক্তিগুলোর বেশি প্রচারে নিয়ে আসে। এর মাধ্যমে তারা বোঝাতে চায়, এক দেশের সাথে আরেক দেশের বাণিজ্যিক চুক্তি হতেই পারে। আবার আরেক দিকে QUAD-এর সাথে সম্পৃক্ত না হলেও তার পরিপূরক কিছু চুক্তি বাংলাদেশ ভারতের সাথে করছে। যেমন: বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে রাডার স্থাপনের চুক্তি। এই রাডার দিয়ে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে নজরদারি বাড়াতে চায় ভারত। এই নজরদারি তারা কেন বাড়াতে চায়, তা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

তাহলে একদিকে চীনের সাথেও সে যেমন Belt and road iniciative-এ যুক্ত হচ্ছে, আবার চীনা জাহাজের উপর নজরদারি বাড়াতে ভারতকে রাডার স্থাপনের সুযোগ করে দিচ্ছে। এইভাবেই সে উভয়কে সন্তুষ্ট করছে; বাইরে প্রচার করছে তারা কোনোটার সাথেই যুক্ত হচ্ছে না। বৈশ্বিক রাজনীতির মারপ্যাঁচে তারা নেই এবং বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা তারা প্রচার করছে যে, তারা কত কৌশলী। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা ঠিকই বৈশ্বিক দুই কৌশলের সাথেই কিছু মাত্রায় যুক্ত হচ্ছে। এবং এটা সামনের দিকে আবারও বাড়বে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এতে কি বাংলাদেশের কোনোই লাভ নেই?

হ্যাঁ, এতে অবশ্যই লাভ আছে। কিন্তু শ্রেণিবিভক্ত সমাজে লাভ কথাটার মানে, কোন শ্রেণির লাভ সেটা আমাদের বিচার করতে হবে। লাভ হচ্ছে বাংলাদেশের কর্পোরেট পুঁজিপতি শ্রেণির। এখানে সাধারণ মানুষ ন্যূনতম কোন স্বার্থ নেই, লাভও নেই। পুঁজিপতি শ্রেণি এখানে দুইভাবে লাভবান হচ্ছে।

এক. বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা ব্যবসাগত লেনদেনে যুক্ত হওয়াতে তার পুঁজি দিন দিন ফুলে-ফেঁপে উঠছে। কিন্তু যে শ্রমিক পণ্য তৈরি করছে, তার জীবনের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। তাকে বরং পুলিশের গুলি খেতে হয়। আবার অবকাঠামো খাতে কন্ট্রাক্ট পায় যে লোকেরা, তারা সরকারের আশেপাশের মানুষ। তাদের পকেটে কাঁচা টাকা ঢুকছে। কিন্তু অবকাঠামো নির্মাণ করছে যে শ্রমিক, তার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। দুই, রাজনৈতিক দিক থেকে লাভবান হচ্ছে কর্পোরেট পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষাকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। অনির্বাচিত এই সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে ভারত-চীন-রাশিয়া-আমেরিকা সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সন্তুষ্ট রাখার কৌশল নিয়েছে। খেয়াল করবেন – এই স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, চীন, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়া শ্রেণির। এখানে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের যেমন কোনো স্বার্থ নেই, তেমনি স্বার্থ নেই ভারতের সাধারণ মানুষের, তেমনি চীন ও আমেরিকার সাধারণ মানুষের। এই জন্য খেয়াল করবেন, ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসেছে, সেখানে সাধারণ জনগণের কোন ম্যান্ডেট নেই। কিন্তু এই সরকারকে সব থেকে আগে স্বীকৃতি দিয়েছে চীন ও ভারতের শাসকশ্রেণি। ফলে শাসকশ্রেণির সাথে শাসকশ্রেণির এই বন্ধুত্ব কখনোই সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করবে না।

সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা যাবে একমাত্র সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম দিতে পারলে। এই রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম দিতে হলে প্রত্যেক দেশের শাসকশ্রেণির আন্তর্জাতিক আগ্রাসী কৌশলগুলোর মুখোশ খুলে দিতে হবে। নিপীড়িত জনগণকে এই কৌশলগুলোর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়াশ্রেণির শোষণ ও গণবিরোধী স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাথে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে সমন্বিত করতে হবে। এবার 'বিজলী' হাতে উপরে উঠলেন নজরুল। রবীন্দ্রনাথকে সামনে বসিয়ে বিদ্রোহী কবিতাটি আবৃত্তি করলেন। এটাই আগের দিন ছাপা হয়েছে 'বিজলী' পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে এতক্ষণ শুনছিলেন, স্তব্ধ হয়ে নজরুলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কবিতা পড়া শেষ হলে তিনি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন এবং দু'হাত প্রসারিত করে তরুণ কবিকে বুকে টেনে নিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ কাজী, তুমি আমাকে সত্যিই হত্যা করবে। আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার কবিতা শুনে। তুমি যে বিশ্ববিখ্যাত কবি হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমার কবিতায় জগৎ আলোকিত হোক, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।' নজরুলের কবিতা সম্পর্কে কবিগুরু মূল্যায়ন করেছিলেন এভাবে, "অরুগ্ন-বলিষ্ঠ-হিংস্র-নগ্ন-বর্বরতা তার অনবদ্য ভাবমূর্তি রয়েছে কাজীর কবিতায় ও গানে। কৃত্রিমতার ছোঁয়াচ তাকে কোথাও ম্লান করেনি, জীবন ও যৌবনের সকল ধর্মকে কোথাও তা অস্বীকার করেনি। মনুষের স্বভাব ও সহজাত প্রকৃতির অকুণ্ঠ প্রকাশের ভিতর নজরুল ইসলামের কবিতা সকল দ্বিধা-গুণের ঊর্ধ্বে তা আসন-গ্রহণ করেছে।"

শেষ পৃষ্ঠা

সাম্যবাদ

৮ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জুন-২০২১

কোভিড ভ্যাক্সিন: যে ব্যবসা জীবন নিয়ে

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে, ১২ ই মে পর্যন্ত প্রথম ডোজের টিকা নিয়েছে প্রায় ৫৮ লাখ মানুষ, আর দ্বিতীয় ডোজের টিকা গ্রহণ করেছে ৩৬ লাখ মানুষ। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে করোনাভাইরাসের নিজস্ব টিকা উৎপাদন বা সে সম্পর্কিত গবেষণার দুর্বল অবস্থার নিরীখে দেশের মানুষের জন্য টিকা নিশ্চত করা দুরূহ কাজ নিঃসন্দেহে। আবার বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে যেসব ভ্যাক্সিন তৈরিতে দীর্ঘসময় লাগত, সেখানে খুব দ্রুতই ভ্যাক্সিন চলে আসছে প্রয়োজনীয়তার জায়গা থেকে। কিন্তু এসবই নিষ্ফল হয়ে যায় যখন বাজারি পণ্যের তকমা গায়ে এঁটে 'টাকা যার ভ্যাক্সিন তার'–এই নীতিতে চলে এবং 'কেউ পায় কেউ পায় না'।

আমরা জানি, কোভিড-১৯ একটি আর এন এ ভাইরাস, যা দ্রুত মিউটেশন বা নিজেকে পরিবর্তন করে এর বিভিন্ন সক্রিয়তার ধরণ ও রূপ বা ভ্যারিয়েন্টে পরিবর্তন হয়। অপর দিকে ভ্যাক্সিন বা টিকা তৈরি হয় যে জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য, ওই জীবাণু দিয়েই। জীবাণুটির রোগ সৃষ্টিকারী অংশটি নষ্ট করে দিয়ে নিষ্ক্রিয় জীবাণুই মানবদেহে টিকা হিসেবে দেয়া হয়। মানব দেহে নিষ্ক্রিয় জীবাণু প্রবেশের ফলে দেহের রোগ প্রতিরোধী অংশগুলো এই জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বলয় গড়ে তুলতে পারে। তাই যখনই বাহিরে থেকে ওই একই ধরনের কোনো সক্রিয় বা রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু মানবদেহে প্রবেশ করে, তখন আগেই তৈরি হওয়া সুরক্ষা বলয় সেই জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং রোগ সৃষ্টি করতে দেয় না। এভাবেই স্মল পক্স, হাম পোলিওর মতো রোগ প্রায় নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে পৃথিবীজুড়ে। কোভিড-১৯ এর দ্রুত মিউটেশনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভ্যাক্সিন যে সবসময়ই কাজ করবে তা বলা মুশকিল। ইতোমধ্যেই কোভিড-১৯ এর ভারতীয়, সাউথ আফ্রিকা, যুক্তরাজ্যসহ নানা ধরনের ভ্যারিয়েন্ট সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে । সব ভ্যারিয়েন্টের জন্য যে একটি নির্দিষ্ট ভ্যাক্সিন কাজ করবে তা বলা যায় না। পৃথিবীর মানুষকে তাই যত দ্রুত টিকা দিয়ে এই রোগ প্রতিরোধী করা যায় তত দ্রুত করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। ইমিউনাইজড বা রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলে সারা বিশ্বে প্রায় ৭০% মানুষের প্রায় ১১ বিলিয়ন ডোজ টিকা দরকার । গত এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ৮.৬ বিলিয়ন টিকা উৎপন্ন হয়েছে যা এক অর্থে অভাবনীয় এবং বিজ্ঞানের সক্ষমতাকেই প্রমাণ করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এর ৬ বিলিয়ন ডোজ চলে যাবে ধনী এবং উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে। এই ৬ বিলিয়ন ডোজ দিয়ে পৃথিবীর প্রায় ৮০% মানুষকে ইমিউনাইজ করা যেত। আবার ৮.৬ বিলিয়ন ভ্যাক্সিনের মধ্যে ৪.৬ বিলিয়ন ভ্যাক্সিন চলে যাবে ধনী দেশগুলোতে, যেখানকার জনসংখ্যা সারা বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ১৬% । এর কারণ হিসেবে বলা যায়, ধনী দেশগুলো ভ্যাক্সিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান গুলোর সাথে আগে থেকেই টাকা দিয়ে ভ্যাক্সিনের অর্ডার করে রাখে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে জীবনের চেয়ে মুনাফা আগে, সেখানে অনেক স্বল্প বা নিম্ন আয়ের দেশগুলোর এর অর্ধেক জনসংখ্যার জন্যও ভ্যাক্সিন কেনার মতো সামর্থ্য নেই। আবার ধনীদেশগুলো ১৬% জনসংখ্যার জন্য ৫৩% ভ্যাক্সিন কিনে মজুদ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে ৩০০ মিলিয়ন উদ্বৃত্ত ভ্যাক্সিনের মধ্যে ৪ মিলিয়ন অব্যবহৃত ভ্যাক্সিন বাইডেন প্রশাসন কানাডা ও মেক্সিকোকে পাঠিয়েছে। যেহেতু সম্পূর্ণ প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভ্যাক্সিন উৎপাদন ও বণ্টন হচ্ছে সেক্ষেত্রে 'টাকা যার ভ্যাক্সিন তার'–এই নীতিতেই চলছে ভ্যাক্সিন ব্যবসা। কিন্তু এক গবেষণায় উঠে এসেছে যে, অক্সফোর্ড/এস্ট্রজেনিকার ভ্যাক্সিন তৈরির পিছনে ৯৭% অর্থই এসেছে সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকা ও দাতব্য সংস্থার থেকে । যুক্তরাষ্ট্রের ৬ টি ভ্যাক্সিন কোম্পানির ভ্যাক্সিন তৈরির জন্য ১২ বিলিয়ন ডলার অর্থ এসেছে জনগণের পকেট থেকে। অথচ ভ্যাক্সিন বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন রকম দামে, ২ ডলার থেকে ৪০ ডলারের মতো। এস্ট্রেজেনিকার ভ্যাক্সিন-এর দাম ইউরোপীয় ইউনিয়নের চেয়ে বাংলাদেশ, সাউথ আফ্রিকার মতো দেশগুলোতে বেশি। ফাইজার বলেছে, কোভিড আক্রান্তের পরিস্থিতির ভয়াবহতা চলে গেলেই দাম বাড়াবে। জনসন এন্ড জনসন আর মডার্নাও একি পথে হাঁটবে। আবার

● ৭ এর পাতায় দেখুন

কোয়াড, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও জনগণের স্বার্থ

মহামারীর এই সময়েও থেমে নেই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর নিজ নিজ আখের গোছানোর কাজ। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। এই রকম একটা সময়েও দেশগুলোর মধ্যে একটা ভূরাজনীতিগত, সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা আমরা লক্ষ করছি। যে প্রতিযোগিতার কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষ নেই, আছে মুনাফা লিপ্সা, একদেশ আরেক দেশকে কূটনৈতিক প্যাঁচে ফেলার মানসিকতা। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় এই রকম কূটনৈতিক আয়োজন QUAD এর কথা শোনা যাচ্ছে। আমেরিকা- ইউরোপের দেশগুলোর সামরিক জোট NATO'র ইতিহাস এবং মধ্যপ্রাচ্যে তাদের কর্মকাণ্ড সারা বিশ্বের মানুষ দেখেছে। এবার সেই আদলে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে QUAD-এর কর্মকাণ্ড জানান দিতে চায় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো।

QUAD কী?

Quardilateral বা 'চতুর্পাক্ষিকের' সংক্ষিপ্ত রূপ হলো QUAD। চতুর্পাক্ষিক হলো চারটি দেশ – যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান ও ভারত নিয়ে অনানুষ্ঠানিক একটি কৌশলগত জোট। এর নেতৃত্বে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০০৭ সাল থেকে এই জোট কাজ শুরু করলেও মাঝখানে এর অগ্রগতি থেমে যায়। ২০১৭ সালের দিকে এর অগ্রগতি আবারও লক্ষ করা যাচ্ছে। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে 'নৌপথে চলাচল স্বাধীন ও নিরাপদ রাখার কৌশল' হিসেবে এই জোট কাজ করবে বলে এর উদ্যোক্তারা প্রচার করছে। প্রকাশ্যে একে NATO'র মতো সামরিক জোট বলা হচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু এর লক্ষ্য যে সেদিকে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ এই অঞ্চলে (এশিয়ায়) চীন-এর প্রভাবকে মোকাবিলার জন্যই এই জোট তৈরি হচ্ছে। আমেরিকার নেতৃত্বে ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের একটা অন্যতম কৌশল হলো এই QUAD।

আমেরিকা ও চীন–দুই সাম্রাজ্যবাদী দেশের পরস্পরবিরোধী কৌশল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমেরিকা অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক দিক থেকে পরাশক্তির আসন দখল করে। সাম্রাজ্যবাদী এই পরাশক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো একমাত্র দেশ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। কিন্তু ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আমেরিকার নেতৃত্বে এক মেরু বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ যেহেতু মজ্জাগতভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, তাই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গত ২০ বছরে ধীরে ধীরে সামনে আসতে থাকে চীন। গত ২০ বছরে চীনে বিশাল উদ্বৃত্ত পুঁজি তৈরি হয়েছে। এই উদ্বৃত্ত পুঁজি চীনের সব জনগণের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত হয়নি, বরং জনগণকে বঞ্চিত করে পুঁজিবাদী Accumulation-এর নিয়মে এই উদ্বৃত্ত পুঁজি তৈরি হয়েছে। ২০১৯ সালের প্রথম ছয় মাসে সরকারি হিসাব অনুযায়ী তাদের কারেন্ট একাউন্টে উদ্বৃত্ত ছিল ৮৮.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (রয়টার্স, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯)। পুঁজির ধর্মই হচ্ছে সে বসে থাকতে পারে না। কোথাও না কোথাও তাকে বিনিয়োগ

● ৭ এর পাতায় দেখুন

ফিলিস্তিন সংকট

আর কত কাল ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়

আবার খবরের শিরোনাম হলো ফিলিস্তিন। ১০-২১ মে টানা ১১ দিন ইজরাইল বিমানহামলা চালালো তার দখলীকৃত এলাকা ছোট্ট ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ড গাজার ওপর। নিহত হলো ২৪৮ জন ফিলিস্তিনি, যার মধ্যে ৬৬ শিশু ও ৩৯ নারী। আহত হলো আরও ১৯৪৮ জন, এর মধ্যে ৫৬০ জনই শিশু। ১০০০ বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস ও ১৮০০ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অন্তত ৯০ হাজার ফিলিস্তিনি গৃহহীন হয়েছে। ৪০টি স্কুল ও ৪টি হাসপাতাল ধ্বংস হয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে শরণার্থী শিবিরে, গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা ও এপি-র অফিস। গাজায় আগ্রাসনের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দমনে ইজরাইলি নিরাপত্তা বাহিনীর হামলায় অপর অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড পশ্চিম তীরে আরও ২৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। অপরদিকে ইজরাইল ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনিদের হাতে তৈরি রকেট হামলায় এক সৈন্য ও দুই শিশুসহ মোট ১২ জনের প্রাণহানি ঘটেছে, আহত হয়েছে ৭৯৬ জন।

অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমের শেখ জাররাহ মহল্লা থেকে ফিলিস্তিনি বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করে ইহুদি বসতি স্থাপনে গত ২৫ এপ্রিল ইজরাইলি আদালতের আদেশের জেরে ফিলিস্তিনিদের বিক্ষোভে পরপর কয়েক দফা মসজিদুল আকসায় হামলা চালায় ইজরাইলি বাহিনী। ৭ মে থেকে ১০ মে পর্যন্ত এই সকল হামলায় ১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন। মসজিদুল আকসা চত্বরে মুসল্লিদের ওপর ইজরাইলি নিরাপত্তা বাহিনীর হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ১০ মে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে মসজিদ থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে ইজরাইলকে আলটিমেটাম দেয় গাজা নিয়ন্ত্রণকারী ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। আলটিমেটাম শেষ হওয়ার পর গাজা থেকে ইজরাইলের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামাস রকেট হামলা শুরু করে। ইজরাইল ভূ-খণ্ডে হামাসের রকেট হামলার অজুহাতে ১০ মে রাত থেকেই গাজায় বিমান হামলা শুরু করে ইজরাইল। প্যালেস্টাইনের গাজা ভূ-খণ্ডে ইজরাইলি সেনাবাহিনীর বোমাবর্ষণ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড ন্যূনতম মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষকে প্রচণ্ডভাবে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করেছে। সারা দুনিয়ায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। অন্যদিকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী শিবির, আরব দেশগুলোর দালাল শাসকবর্গ ও জাতিসংঘ গাজায় বেসামরিক জনগণকে রক্ষায় পদক্ষেপ নেওয়া দূরের কথা, বরং 'ইজরাইলের আত্মরক্ষার অধিকারের' প্রতি সমর্থন দিয়েছে। ইজরাইল ফিলিস্তিনিদের দেশ দখল করেছে, লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তনিদের তাদের ভিটে-মাটি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমানেও ফিলিস্তিনি প্রধান পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করে ইহুদি বসতি সম্প্রসারণ করছে। এর বিরুদ্ধে নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের প্রতিবাদ দমন করতে ত্রাস সৃষ্টির লক্ষ্যে এই হত্যাযজ্ঞ চালানো হচ্ছে। ইসরাইলের জায়নবাদী শাসকরা চায় ফিলিস্তিনিরা নীরবে দখলদারিত্ব ও আধিপত্য মেনে নিক।

গত ৭৩ বছর ধরে একদিকে জায়নবাদী ইজরায়েল ফিলিস্তিনকে নিশ্চিহ্ন করতে চাচ্ছে। তার বিপরীতে ফিলিস্তিনের বীর জনতা বুক চিতিয়ে লড়াই করে যাচ্ছে। যারা ইসরায়েলের দখলদারিত্ব-উপনিবেশিকীকরণ-অবরোধ-নির্যাতনের অবসান দাবি না করে ফিলিস্তিনিদের সশস্ত্র প্রতিরোধের নিন্দা জানায় - তারা হয় সাম্রাজ্যবাদী মতলববাজ, নয় প্যালেস্টাইনের পরিস্থিতি সম্পর্কে চূড়ান্ত অজ্ঞ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মদতে ইজরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। পরবর্তীতে আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্বের অকুণ্ঠ সমর্থনে ক্রমাগত দানবে পরিণত হয়েছে ইজরায়েল। ইজরায়েলের স্বপক্ষে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন

● ৫ এর পাতায় দেখুন

সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি **মুবিনুল হায়দার চৌধুরী**, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা–১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স–৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org; ই-মেইল : mail@spbm.org